দারুল মুত্তাক্বীন শিক্ষাবৃত্তি ২০২৪

বইটি প্রণয়নে কাজ করেছেন যারাঃ

মোহাম্মদ নাজমুল হোসাইন	সাইফুল্লাহ সাদী
আনিসুর রহমান	আতিক বিন ছানোয়ার
ফরহাদ আলি	মো. তরিকুল ইসলাম
রাশেদুল ইসলাম রাছেল	আরাফাত নাসির (নাসিরুল)
মোঃ নাহিদ হোসেন	সালেহ ফারহান
আব্দুল্লাহ বিন আসাদ	আলামিন মিয়া
মনির হোসাইন	মো. তানভীর হোসেন

প্রচ্ছদ ডিজাইনঃ আনিসুর রহমান ও মুহাম্মদ আলামীন

সার্বিক নির্দেশনাঃ আশিকুর রহমান

প্রকাশক: দারুল মুত্তাক্বীন ফাউন্ডেশন

ঠিকানা: তক্তারচালা, সখিপুর, টাংগাইল

প্রকাশকাল: আগষ্ট ২০২৪

যোগাযোগ: 01927920081

শুভেচ্ছা মূল্য: ১২০ টাকা মাত্র

DARUL MUTTAQUINE
SOCIAL COMMUNITY

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহ তায়ালা এই বইটিকে আসন্ন "দারুল মুত্তাক্বীন শিক্ষাবৃত্তি ২০২৪" এর সিলেবাস হিসেবে প্রণয়নে সুযোগ দিয়েছেন।

পরের মঙ্গল কামনা (অন্যের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা); পরের জন্য কিছু করার মানসিকতাই একদিন ব্যক্তি আমিকে ভালো মানুষ হতে সহায়তা করে। আমরা সবাইকে ভালো মানুষ হতে উপদেশ দিই কিন্তু ভালো মানুষ হয়ে উঠার পথ-পরিক্রমা অনেক ক্ষেত্রেই বাতলে দিই না। (গরীব-অসহায়-দুঃস্থ-এতিম) আশেপাশের মানুষের জন্য কিছু করতে চেষ্টা করলে যে নিজের অজান্তেই মানসিক প্রশান্তি মিলে; ভালো মানুষ হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করা যায় তা বুঝি আমরা অনেকেই আজও ঠাহর করতে পারছিনা! ধরে নিলাম আমাদের অনেকেরই ইচ্ছা আছে কিন্ত ফুরসত/সুযোগের অভাব। নিজের জন্য/নিজেদের জন্য/আপনাদের জন্য এ ধরণের ফুরসত সৃষ্টি করতে "দারুল মুত্তাক্বীন ফাউন্ডেশন (উগঋ)" এর যাত্রা শুরু ২০২০ সালে। আমাদের লক্ষ্য: "শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীন শিক্ষা, প্রচার-প্রসার ও কল্যাণকর কাজের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখা"

দারুল মুত্তাক্বীন ফাউন্ডেশন একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক শিক্ষা, দাওয়াহ ও পূর্ণত মানবকল্যাণে নিবেদিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। দারুল মুত্তাক্বীন এর এই শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রমটি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সুদুর প্রসারী চিন্তাভাবনার একটি অংশ। দারুল মুত্তাক্বীন মনে করে শিক্ষার্থীরা দুনিয়াবী ও পরকালীন (নৈতিক) শিক্ষার সমন্বয়েই কেবলমাত্র আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

শিক্ষাবৃত্তিকে আরো বেশী সুন্দর, যুগোপযোগী ও শিক্ষার্থীদের জন্য অধিক কল্যাণকর করতে দারুল মুত্তাক্বীন আপনাদের যে কোন পরামর্শ গুরুত্বসহকারে নিবে (ইং শা আল্লহ)।

- আশিকুর রহমান

সূচিপত্র

১. Changing Word 4

২. আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? 12

৩. আমরা কিভাবে ঈমান আনবো? 14

৪. আত্মশুদ্ধির উপায় 19

৫. আল্লাহ তা'আলার ২৫টি নাম ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 21

৬. যাকাতের হিসাব বের করার নিয়ম 30

৭. হাদীসের শিক্ষা 33

৮. প্রাত্যহিক জীবনে রাসূল (স:) এর উল্লেখযোগ্য কিছু সুন্নাহ 39

৯. আল কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান 46

১০. কৈশোরে/যৌবনে কিভাবে আমাদের পদস্খলন ঘটে; মুক্তির পথ ... 51

১১. সময়ের সাতকাহন 66

১২. কারিগরি / বৃত্তিমূলক শিক্ষা 77

১৩. ইসলামী ইতিহাস 79

১৪. আল-আকসা 89

১৫. সাধারণ জ্ঞান 92

Changing Word

Changing word বলতে একটি word বা শব্দকে এক parts of speech থেকে অন্য parts of speech এ রুপান্তর/পরিবর্তন করাকে বুঝায়।

একটি শব্দ সাধারণত নিম্নলিখিত parts of speech গুলোর মধ্যে রুপান্তর হয়:

Noun ← → Verb ←→ Adjective ←→ Adverb

<u>Noun (n) বা adjective (adj) থেকে verb গঠনঃ</u>

1: নিম্নলিখিত noun গুলোর আগে em (prefix) যোগ করে verb গঠন করা হয়:

Noun	Verb
power (ক্ষমতা)	empower (ক্ষমতাসম্পন্ন করা)
bank (তীর)	embank (বাঁধ দেওয়া)

2: নিম্নলিখিত শব্দগুলোর আগে en (prefix) যোগ করে verb গঠন করা হয়:

Noun/Adj	Verb
large (adj, বড়)	enlarge (প্রসারিত করা)
rich (adj, ধনী)	enrich (ধনী করা)
danger (n, বিপদ)	endanger (বিপদাপন্ন করা)
list (n, তালিকা)	enlist (তালিকাভুক্ত করা)

3: নিচের শব্দগুলোর আগে be (prefix) যোগ করে verb গঠন করা হয়:

Noun/Adj	Verb
head (noun, মাথা)	behead (শিরচ্ছেদ করা)
little (adj, ছোট)	belittle (ছোট/তুচ্ছ করা)
fool (adj, বোকা)	befool (বোকা বানানো)

4: নিচের শব্দগুলোর শেষে ise (suffix) যোগ করে verb গঠন করা হয়:

Noun/Adj	Verb
memory (n,স্মৃতি)	memorise (মুখস্ত করা)
apology (n, ক্ষমা)	apologise (ক্ষমা চাওয়া)
authority (n,ক্ষমতা)	authorise (ক্ষমতা অর্পণ করা)
equal (adj, সমান)	equalise (সমতা করা)

5: নিচের শব্দগুলোর শেষে en (suffix) যোগ করে verb গঠন করা হয়:

Noun/Adj	Verb
strength (n,শক্তি)	strengthen (শক্তিশালী করা)
broad (adj, প্রশস্ত)	broaden (প্রশস্ত করা)
sweet (adj, মিষ্টি)	sweeten মিষ্টি করা)
thick (adj, পুরু)	thicken (পুর করা)

6: নিচের শব্দগুলোর সাথে ify/fy (suffix) যোগ করে verb গঠন করা হয়:

Noun/Adj	Verb
beauty (n, সৌন্দর্য)	beautify (সুন্দর করা)
ample (adj, প্রচুর)	amplify (ভাব সম্প্রসারণ করা)
clear (adj, পরিস্কার)	clarify (ব্যাখ্যা করা)
class (n, শ্রেণী)	classify (শ্রেণীবিভাগ করা)

7: কিছু কিছু শব্দের মধ্যে vowel (a,e,i,o,u) পরিবর্তন করে verb গঠন করা হয়:

Noun	Verb
choice (পছন্দ)	choose (পছন্দ করা)
food (খাদ্য)	feed (খাওয়ানো)
blood (রক্ত)	bleed (রক্তপাত হওয়া)
knot (গিঁট)	knit (গিঁট দেওয়া)
bond (বন্ধন)	bind (বাঁধা)

Verb হতে Noun গঠন:

1: Verb এর শেষে (de বা d থাকলে)sion/tion (suffix) যোগ করে noun গঠন করা হয়:

Verb	Noun
Decide (স্থির করা)	decision (সিদ্ধান্ত)
upgrade (মান উন্নয়ন করা)	upgradation (মান উন্নয়ন)
pretend (ভান করা)	pretension (ভান)
attend (মনোযোগ দেওয়া)	attention (মনোযোগ)

2: কোন কোন verb এর শেষে ment (suffix/প্রত্যয়) যোগ করে noun গঠন করা হয়:

Verb	Noun
agree (রাজী হওয়া)	agreement (সম্মতি)
upgrade (মান উন্নয়ন করা)	upgradation (মান উন্নয়ন)
govern (শাসন করা)	government (শাসক/সরকার)
improve (উন্নতি করা)	improvement (উন্নতি)
punish (শাস্তি দেওয়া)	punishment (শাস্তি)

3: verb এর শেষে al (suffix/প্রত্যয়) যোগ করে noun গঠন করা হয়:

Verb	Noun
refuse (অস্বীকার করা)	refusal (অস্বীকৃতি)
apprrove (অনুমোদন করা)	approval (অনুমোদন)
propose (প্রস্তাব করা)	proposal (প্রস্তাব)
arrive (উপস্থিত হওয়া)	arrival (আগমন)

4: verb এর শেষে te/t থাকলে(te/t এর পরিবর্তে)tion যোগ করে noun গঠন করা হয়:

Verb	Noun
select (পছন্দ করা)	selection (পছন্দ)
locate (স্থান নির্দেশ করা)	location (অবস্থান)
elect (নির্বাচন করা)	election (নির্বাচন)
invite (নিমন্ত্রণ করা)	invitation (নিমন্ত্রণ)
connect (যুক্ত করা)	connection (সংযোগ)

5: verb এর সাথে বিভিন্ন ধরণের suffix (প্রত্যয়) যোগ করে noun গঠন:

Verb+suffix	Noun
grow (জন্মানো)+ th	growth (বৃদ্ধি)
do (করা)+ er	doer (কর্তা/যে করে)
hate (ঘৃণা করা)+ red	hatred (ঘৃনা)
waste (অপচয় করা)+age	wastage (অপচয়)
Know (জানা) +ledge	knowlege (জ্ঞান)
accept (গ্রহণ করা)+ ance	acceptance (গ্রহণ)
exist (বিদ্যমান থাকা)+ence	existence (অস্তিত্ব)
please (সন্তুষ্ট করা)+ure	pleasure (আনন্দ)

এছাড়া-

* see (v, দেখা) এর noun হলো sight (দৃষ্টি)

* advise (v, উপদেশ দেয়া) এর noun হলো advice (উপদেশ)

* repeat (v, পুনঃ উল্লেখ করা) থেকে repetition (n, পুনরাবৃত্তি)

* think (v, চিন্তা করা) থেকে thought (n, চিন্তা)<u>Adjective থেকে Noun গঠন:</u>

1: Adjective এর শেষে hood/dom যোগ করে noun গঠন করা হয়।

Adjective	Noun
free (স্বাধীন)	freedom (স্বাধীনতা)
wise (জ্ঞানী)	wisdom (প্রজ্ঞা)
false (মিথ্যা)	falsehood (মিথ্যা কথা)

বি:দ্র: তবে কিছু common noun এর শেষেও hood/dom যুক্ত হয়ে abstract noun গঠিত হয়

Common noun	Abstract noun
child (শিশু)	childhood (শৈশব)
king (রাজা)	kingdom (রাজ্য)
boy (বালক)	boyhood (বাল্যকাল

2: Adjective এর শেষে te/et/ent থাকলে (te/et/ent এর জায়গায়)cy/ce যোগ করে noun গঠন করা হয়।

Adjective	Noun
private (গোপনীয়)	privacy (গোপনীয়তা)
literate (অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন)	literacy (স্বাক্ষরতা)
intimate (অন্তরঙ্গ)	intimacy (অন্তরঙ্গতা)
secret (গোপনীয়)	secrecy (গোপনীয়তা)
patient (ধৈর্যশীল)	patience (ধৈর্য)
independent (স্বাধীন)	independence (স্বাধীনতা)
decent (ভদ্র)	decency (ভদ্রতা)

3: Adjective এর শেষে ness যোগ করে noun গঠন করা হয়।

Adjective	Noun
happy (সুখী)	happiness (সুখ)
bright (উজ্জ্বল)	brightness (উজ্জ্বলতা)
new (নতুন)	newness (নতুনত্ব)
fresh (সজীব)	freshness (সজীবতা)

4: Adjective এর শেষে (al/le/ar/or/ane/ain থাকলে) ity/ty/ety যোগ করে noun গঠন করা হয়।

Adjective	Noun
moral (নৈতিক)	morality (নৈতিকতা)
fertile (উর্বর)	fertility (উর্বরতা)
regular (নিয়মিত)	regularity (নিয়মানুবর্তিতা)
superior (শ্রেষ্ঠতর)	superiority (শ্রেষ্ঠত্ব)
certain (নিশ্চিত)	certainty (নিশ্চয়তা)
humane (দয়ালু)	humanity (মানবতা)

5: Adjective এর শেষে ure/ous থাকলে তার পরিবর্তে ity/ety যোগ করে noun গঠন করা হয়।

Adjective	Noun
sure (নিশ্চিত)	surety (নিশ্চয়তা)
pure (পবিত্র)	purity (পবিত্রতা)
various (ভিন্ন)	variety (ভিন্নতা)
anxious (উদ্বিগ্ন)	anxiety (উদ্বিগ্নতা)
prosperous (উন্নত)	prosperity (উন্নতি)

Noun থেকে adjective গঠন

1: Noun এর শেষে ful যোগ করে adjective গঠন করা হয়।

Noun	Adjective
duty (দায়িত্ব)	dutiful (দায়িত্ববান)
power (শক্তি)	powerful (শক্তিশালী)
beauty (সৌন্দর্য)	beautiful (সুন্দর)
success (সাফল্য)	successful (সফল)
fruit (ফল)	fruitful (ফলদায়ক)

2: Noun এর শেষে ce/cy থাকলে তার পরিবর্তে (ce/cy এর জায়গায়) t যোগ করে adjective গঠন করা হয়।

Noun	Adjective
obedience (আনুগত্য)	obedient (অনুগত)
diligence (পরিশ্রম)	diligent (পরিশ্রমী)
dependence (নির্ভরশীলতা)	dependent (নির্ভরশীল)
difference (ভিন্নতা)	different (ভিন্ন)
currency (প্রচলন)	current (প্রচলিত)

3: কিছু কিছু noun এর শেষে nce/se/ent থাকলে তার পরিবর্তে (nce/se/ent এর জায়গায়) al/tial যোগ করে adjective গঠন করা হয়।

Noun	Adjective
universe (বিশ্ব)	universal (বিশ্বসংক্রান্ত/সার্বজনীন)
accident (দূর্ঘটনা)	accidental (দূর্ঘটনাজনিত)
residence (বাসস্থান)	residential (আবাসিক)
dent (দাঁত)	dental (দাঁত সম্পর্কিত)
sentiment (আবেগ)	sentimental (আবেগপ্রবণ)

Verb থেকে adjective গঠন:

1: Verb এর শেষে able যোগ করে adjective গঠন করা হয়।

Verb	Adjective
eat (খাওয়া)	eatable (খওয়ার যোগ্য)
comfort (আরাম দেওয়া)	comfortable (আরামদায়ক)
sentiment (আবেগ)	sentimental (আবেগপ্রবণ)
homour (সম্মান দেওয়া)	honourable (সম্মানীয়)

2: Verb এর শেষে ate থাকলে (e বাদ দিয়ে) ive যোগ করে adjective গঠন করা হয়।

Verb	Adjective
narrate (বর্ণনা করা)	narrative (বর্ণনামূলক)
create (সৃষ্টি করা)	creative (সৃষ্টিশীল)
irritate (উত্তেজিত করা)	irritative (উত্তেজনাকর)
suffocate (শ্বাস রোধ করা)	suffocative (শ্বাসরুদ্ধকর)

3: Verb এর শেষে e থাকলে e বাদ দিয়ে able যোগ করে adjective গঠন করা হয়।

Verb	Adjective
move (সরানো)	movable (সরানো যায় এমন)
measure (পরিমাপ করা	measurable (পরিমেয়)
endure (সহ্য করা)	endurable (সহনীয়)
deceive (ঠকানো)	deceivable (ঠকানো যায় এমন)

নমুনা প্রশ্ন:

ব্র্যাকেটে নির্দেশিত parts of speech এ পরিবর্তন করতে হবে।

1. Thought (verb)

2. Fruit (adj)

3. Pure (noun)

4. Agree (noun)

আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এর মাঝে রয়েছে আসমান যমিন অসংখ্য নক্ষত্র, গাছপালা, পশুপাখি, নাম জানা অজানা নানা রকম সৃষ্টি। এর মাঝে রয়েছে মানুষ। আল্লাহ মানুষকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি জগতের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন; "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম আকৃতিতে" (আত ত্বীন- ৪)। এই মানব জাতীকে সৃষ্টি করাত পেছনে রয়েছে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হেকমত ও প্রজ্ঞা। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন; আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেস্তাদের বললেন আমি জমিনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি, তখন তাঁরা বললো আপনি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করছেন যে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে.? আর আমরা আপনার তাসবীহ পড়ি, পবিত্রতা বর্ণনা করি। তিনি বললেন; নিশ্চয় আমি যা জানি তোমরা তা জানোনা। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য, তাঁর দাসত্ব করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বলেন,আমি মানুষ ও জীন জাতীকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদত করার জন্য। (যারিয়াত: ৫৬)

<u>কিভাবে ইবাদত করবেনঃ</u>

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য। তখন তাঁর হিকমতের দাবী হলো মানুষকে তিনি জানিয়ে দিবেন কিভাবে তাঁর ইবাদত করতে হবে। কখন কোন সময় কিভাবে ইবাদত করতে হবে। এজন্য তিনি বিভিন্ন যুগে অনেক নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী হলেন মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি তার উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন কোনটি ইবাদত। মহান আল্লাহ তায়ালা কোন কাজটি করতে বলেছেন, কোনটি নিষেধ করেছেন। তিনি তাঁর বরকতময় জীবনে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে ইবাদত করতে হবে, নিজে করে দেখিয়েছেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পরে যদি এমন কোন কাজ করা হয় যেটি তিনি করেননি, করার আদেশ দেননি, তাহলে সেটা বিদ'আত বলে গণ্য হবে। "কেউ যদি দ্বীনের বিষয়ে এমন কাজ করে, যে বিষয়ে আমাদের কোন আদেশ নেই তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত" (মুসলিমঃ ২৭১৮)

<u>ইবাদত কাবুলের শর্ত সমূহঃ</u>

১. ঈমান আনায়ন করাঃ

দদসুতরাং কোন মুসলিম যদি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। তেমনিভাবে কেউ যদি ঈমান আনার পর কুফরী করে তাহলে তার সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন; "কেউ ঈমানের সাথে কুফরি করলে তার আমল বাতিল হবে, আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে" (মায়িদা-০৫)

২. ইখলাস বা একনিষ্ঠতাঃ

আর তা হলো একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন; "আর তোমাদের আদেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তারই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে" (বায়্যিনাত- ০৫)

৩. রিয়ামুক্ত থাকতে হবেঃ

আর তা হলো, আর তা হলো লোক দেখানো ইবাদত করা। রসুল সা. বলেন; আমি ভয় করি তোমরা ছোট শিরকে পতিত হবে, তাঁরা বলল, হে আল্লাহর রসুল, ছোট শিরক কি.? আল্লাহর রসুল বললেন, রিয়া; তথা লোক দেখানো আমল।

৪. রসুল সা. এর অনুসরণঃ

আল্লাহ তায়ালা বলেন; রসুল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, যা নিষেধ করেন তা বর্জন করো। আর যে ইবাদতের নতুন কোন পদ্ধতি বের করে যা রসুল সা. করেননি বা করার আদেশ দেননি, মূলত সে এই অপবাদ দেয় যে, রসুল সা. তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেননি।

৫. বিদ'আত থেকে বিরত থাকাঃ

বিদ'আত হচ্ছে রসুলের মৃত্যুর পর নতুন কোন ইবাদত তৈরি করা বা নতুন কোন ইবাদতের পদ্ধতি বের করা যা রসুল সা. করেনিনি। আর রসুলের আদেশ বা অনুমতি ব্যতীত যে আমল করা হয় তা প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন; "হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহর ও রসুলের আনুগত্য করো আর তোমাদের কর্মকে নিষ্ফল করোনা" (মুহাম্মদ- ৩৩)

রসুল সা. বলেন; "কেউ যদি আমাদের দ্বীনে নতুন কোন ইবাদত চালু করে যা তার অন্তর্ভুক্ত নিয়, তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত" (মুসলিমঃ ১৭১৮)

<u>বিশ্বজগত সৃষ্টির হিকমাহঃ</u>

বিশ্বজগত সৃষ্টির পেছনে একটি হিকমাহ হলো আল্লাহর তায়ালার ক্ষমতা প্রকাশ করা। যেমন আল্লাহর একটি নাম হলো 'আর রহমান' তথাঃ দয়াময়। এই নামের কারণে তিনি বিশ্বের সকলের প্রতি দয়া করেন, সে কাফির হোক বা মুমিন হোক। তাঁর আরেক নাম হলো 'আল খলিক'। এই নামের প্রকাশ ঘটে সৃষ্টি করার মাধ্যমে। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত এই সকল কিছুই এই নামের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তায়ালা বলেন; তিনি আল্লাহ, তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং অনুরূপ জমিন। তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ ; "যাতে তোমরা জানতে পারো আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন" (ত্বলাকঃ ১২)

আমরা কিভাবে ঈমান আনবো?

ঈমান শব্দটি আরবী। শাব্দিক অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। পরিভাষায় ঈমান বলতে - মুখ দ্বারা স্বীকৃতি প্রদান, অন্তরে বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়ন করা। অর্থাৎ ঈমানের তিনটি অংশ রয়েছে:

১.মুখ দ্বারা স্বীকৃতি প্রদান করা

২. অন্তরে বিশ্বাস করা

৩. অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাজ করা।

সুতরাং কেউ যদি তিনটির যেকোন একটি বাদ দেয় তাহলে সে মুসলিম হতে পারবে না।

অর্থাৎ কেউ মুখে স্বীকৃতি দিলো কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করলো না বা অন্তরে বিশ্বাস করলো কিন্ত মুখে স্বীকৃতি দিলো না অথবা মুখে স্বীকৃতি দিয়েছে, অন্তরে বিশ্বাস করেছে কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ দ্বারা বাস্তবায়ন করেনি তাহলে সে মুসলিম বলে গণ্য হবে না। যেমন টি বলে দিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি সালামের চাচা আবু তালেব। তিনি মনে মনে ঈমান এনেছিলেন,কিন্তু মুখে স্বীকৃতি দেন নি,যার কারণে তিনি মুশরিক হিসেবেই মৃত্যু বরন করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ইসলামে যে সকল কাজের আদেশ দেওয়া রয়েছে বা নিষেধ করা হয়েছে,কেউ যদি তা অস্বীকার করে তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। যেমন কেউ সলাত,যাকাত,রোযা বা অযু ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করলো তাহলে সে কাফের বলে গণ্য হবে।

এগুলো আদেশকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে, হারাম-কৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন,সুদ, ঘুষ, মদ খাওয়াকে বৈধ মনে করে তাহলে সেও অমুসলিম তথা কাফের বলে গণ্য হবে। আর ফরয কৃত বিষয়ের মাঝ থেকে শুধুমাত্র নামায পরিত্যাগ করলেই ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে,নামাজ না পরলে কি হবে, ঈমান তো ঠিক ই আছে। প্রচলিত এই কথা টি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা রাসূল(সাঃ) বলেন, "কোনো ব্যাক্তির শিরক ও কুফরের মাঝে পার্থক্য হলো সালাত পরিত্যাগ করা" (মুসলিম: ১৩৪/৮২)

আর সালাত ব্যতীত অন্যান্য কোনো ফরয বিধান স্বীকার করার পরও যদি অলসতা বশত আদায় না করে তাহলে সে পাপী মুসলিম বলে বিবেচিত হবে।

<u>যে সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবেঃ</u>

ঈমানের রুকন ৬টি বা ছয়টি বিষয়ের উপর ঈমান আনতে হবে।

১.আল্লাহর প্রতি

২.ফেরেশতাদের প্রতি

৩.আসমানী কিতাবের প্রতি

৪.রাসূলগনের প্রতি

৫.আখিরাত তথা শেষ দিবসের বিচার ফয়সালার প্রতি

৬.তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি

[দলীলঃ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তার ফেরেশতা, কিতাব সমূহ,রাসূলগন,শেষ দিবসের প্রতি ও ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি" মুসলিম:১/৮]

আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনায়ন ৩ ভাগে বিভক্ত।

১. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ তথা আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, সকল কিছুর পরিচালনাকারী হিসেবে মেনে নেওয়া। ভালো মন্দের মালিক,রোগ দেওয়া, রোগ নিয়াময় করা সকল কিছু আল্লাহ তালা করেন। যদি কেউ বিশ্বাস করে আসমান-যমিন এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছে,আলাহ তালা রিজিক দেন না বরং আমরা পরিশ্রম করে উপার্জন করি, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ পীর বা ওলি আওলিয়া আসমান যমিন পরিচালনা করছে,আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে তাহলে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। কাফের- মুশরিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "বলুন যমীন এবং এতে যা কিছু আছে এগুলো কার যদি তোমরা জানো তবে বলো। অবশ্যই তারা বলবে আল্লাহর। বলুন তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহন করবে না। বলুন সাত আসমান ও মহা আরশের রব কে? তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহর। বলুন তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না। বলুন কার হাতে সমস্ত বস্তুর কর্তৃত্ব? যিনি আশ্রয় প্রদান করেন অথচ তার বিপক্ষে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না,যদি তোমরা জানো তবে বলো। তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহর। বলুন, তাহলে কোথা থেকে তোমরা জাদু গ্রস্থ হচ্ছো" [সূরা আল মুমিনূন ৮৪-৮৯]

গায়েবের বিষয়ে দলিলঃ

* আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর গায়েবের চাবি তারই কাছে রয়েছে,তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না" [সূরা আল আনআম-৫৯]

২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ তথা সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা। তারই নিকট সাহায্য চাওয়া,তার নামে মানত করা, যবেহ করা,কসম ও শপথ করা, যেটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না,তা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা। যেমন সন্তান চাওয়া,বৃষ্টি কামনা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো,তার সাথে কাউকে শরীক করো না চ[সূরা নিসা-৩৬]

৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত তথা আল্লাহর সুন্দর সুন্দর গুনাবলীতে বিশ্বাস করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাকে সেসব নামেই ডাকো। আর যারা তার নাম বিকৃতি করে তাদের কে বর্জন করো,তাদের কৃত কর্মের ফল অচিরেই তাদের কে দেওয়া হবে। [সূরা আল আরাফ-১৮০]

আমাদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে যে আল্লাহর নাম ৯৯ টি। এটি ভুল কথা। বরং সঠিক হচ্ছে একটি হাদীসে আল্লাহ তা'আলার ৯৯ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কতগুলো নাম রয়েছে তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। রাসূল(সাঃ) একটি দোয়ায় উল্লেখ করেন, " আমি আপনার নিকট আপনার ঐ সকল নামের মাধ্যমে চাচ্ছি যা আপনি আপনার ইলমে গায়েবের মাঝে রেখেছেন।চ (শারহুল আক্বীদা ত্বহাবীয়া-১০৮ নং পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুনাবলী কুরআন সুন্নায় যেভাবে এসেছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কোনো অপব্যখ্যা বা কারো সাথে সাদৃশ্য দেওয়া যাবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলার একটি নাম হচ্ছে - সর্বশ্রোতা। এটা বলা যাবে না যে,মানুষ ও পশুপাখি ও শ্রবণ করে,তাহলে আল্লাহ ও মানুষের শ্রবণ একি রকম বা..... শব্দের অর্থ আমরা জানি না। কারণ হলো আল্লাহ তা'তালা আরবী ভাষা জানেন,তারপরও তিনি এই শব্দ ব্যবহার করেছেন। এবং রাসূল(সাঃ) ছিলেন স্পষ্ট আরবীভাষী। আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ জ্ঞানী। সুতরাং তিনি যখন ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং অন্য কোনো অর্থ বর্ননা করেন নি,তাই এই সকল শব্দ ব্যবহার করতে হবে এবং তার অর্থও বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহর সিফাত কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য নেই বরং তার বড়ত্ব ও মহত্বের সাথে যেভাবে যাই,তিনি সে রকম।

৪. আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কতিপয় ভুল ধারণা:

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। এটি ভুল কথা বরং সঠিক হচ্ছে আল্লাহ আরশের উপর রয়েছেন। কুরআনুল কারীমে ৭ স্থানে রয়েছে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর রয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হলোঃ আল্লাহ বলেন, "দয়াময় রহমান আরশের উপর রয়েছেনচ[সূরা ত্বহা-৫]

আল্লাহ তা'আলার আকার নেই। এটিও ভুল কথা। বরং আল্লাহর আকার রয়েছে এবং মুমিন রা জান্নাতে আল্লাহ কে দেখতে পাবে। রাসূল (সাঃ) বলেন "শীঘ্রই তোমরা তোমাদের রবকে কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে,যেমন এ চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছো এবং তাকে দেখতে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছেনাচ[সহীহ বুখারী-৭৪৩৬]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, " আর ইহুদিরা বলে আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের হাতই বন্ধ এবং তাদের এই উক্তির ধরুন তারা অভিশপ্ত। বরং আল্লাহর দুই হাত উন্মুক্ত, তিনি যেমন ইচ্ছা ব্যয় করেন।চ[সূরা মায়িদাহ-৬৪]

"আল্লাহ তালার মুখমণ্ডল রয়েছে। আল্লাহ বলেন, আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহেরা, যিনি মহিমাময় মহানুভব।চ[সূরা আর রহমান-২৭]

আল্লাহ তা'তালার পা রয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেন, "জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে জাহান্নাম বলবে আরো আছে কি? শেষে আল্লাহ তার পা সেখানে রাখবেন তখন সে বলবে আর না, আর না।চ[বুখারী -৮২৮২]

তবে মনে রাখতে হবে যে, কুরআন সুন্নায় যেগুলো বর্নিত হয়েছে শুধু সেগুলোর কথা বলা যাবে। যেমন, হাত, পা এবং আল্লাহর সাথে সৃষ্টি জগতের কারো সাথে সাদৃশ্য বা তুলনা করা যাবেনা। আল্লাহ বলেন, "কোন কিছুই তার সদৃশ্য নয়,তিনি সর্বশ্রোতা,সর্বদ্রষ্টা।চ[সূরা আশ-শূরা ১১]

৫. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাদের ব্যাপারে ঈমান রাখা যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন। তারা নূরের তৈরি। তারা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে। তারা আদেশের অবাধ্য হয় না। তাদের খাবার, বিয়ে শাদির প্রয়োজন নেই।আল্লাহর আদেশে তারা বিভিন্ন দ্বায়িত্বে নিয়জিত রয়েছেন। মর্যাদা অনুসারে কারো দুই,তিন,চার পাখা রয়েছে, কারো তার থেকে বেশি। আল্লাহ বলেন, "সমস্থ প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা,যিনি ফেরেশতাদের দূত করেন,যারা দুই-দুই, তিন-তিন অথবা চার-চার পাখা বিশিষ্ট।চ[সূরা ফাতিহা-১]

৬. কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে হেদায়েত দেওয়ার জন্য অসংখ্য নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদের উপর কিতাব নাজিল করেছেন। এই কিতাবের সংখ্যা কত তা জানা যায় না। কুরআন কারীমে কয়েকটি নাম এসেছে তা হলোঃ কুরআন মাজিদ,তাওরাত, যাবুর,ইঞ্জিল,সুহুফু ইবরাহীম, সুহুফে মূসা। আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে যে আসমানী কিতাব ১০৪ টি। এসম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা জাল হাদীস। তাই কিতাব সমূহের প্রতি আমরা সামগ্রিক ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবো যে, আল্লাহ যত কিতাব নাযিল করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনলাম।

৭. রাসূলগনের প্রতি ঈমান

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন আদম থেকে মুহাম্মদ পর্যন্ত সকলের উপর ঈমান আনতে হবে। হাদীসে বর্নিত হয়েছে, নবীদের সংখ্যা ১ লক্ষ চব্বিশ হাজার এবং রাসূলদের সংখ্যা তিনশত তেরোজন। প্রথম নবী আদম (আঃ) এবং শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ)। মুহাম্মদ (সঃ) এর পর আর কোন নবী আসবে না। আল্লাহ বলেন, "মুহাম্মদ কোনো পুরুষের পিতা নয়,কিন্তু আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবীচ[সূরা আহযাব-৪]

তাই কেউ যদি মুহাম্মাদ (সঃ) এর পরে নবী দাবি করে সে মিথ্যুক ও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। নবীদের ব্যাপারে আরো বিশ্বাস করতে হবে যে তারা ছিলেন নিষ্পাপ, মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ট মানুষ।

নবীদের সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণাঃ

→ ইলিয়াস (আঃ) ও খাযির(আঃ) [প্রচলিত - খিযির] জীবিত আছে। এটি ভুল। বরং তারা মারা গেছেন। রাসূল তার শেষ বয়সে বলেন, " আজকে যারা যমীনের উপর জীবিত রয়েছে ১০০ বছর পর তারা কেউ জীবিত থাকবে না।"

→ মুহাম্মদ (সঃ) কে সৃষ্টি করা না হলে দুনিয়া সৃষ্টি করা হতো না। এটি একটি বানোয়াট হাদীস।

→ রাসূল নূরের তৈরি। এটিও ভুল। কেননা আল্লাহ বলেন, " হে নবী আপনি বলুন আমি তোমাদের মতই মানুষ, আমার নিকট ওহী নাযিল হয়।"[সূরা কাহফ- ১১০]

→ রাসূল কবরে জীবিত। আল্লাহ বলেন, "হে নবী তুমি তো মরণশীল আর তারাও মৃত্যুবরণ করবে।"[সূরা যুমার-৩০]

→ রাসূল গায়েবের খবর জানতেন। এটি রাসুলের নামে মিথ্যাচার। গায়েবের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ বলেন, "গায়েবের খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না"(সূরা আন আম-৫৯)

আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করাঃ

মানুষ মারা যাবে কিয়ামত সংঘটিত হবে। হিসাব-নিকাশের জন্য সকলকে আবার জীবিত করা হবে। মিত্যুর পর কবরের নিয়ামত বা শাস্তি হওয়া কে বিশ্বাস করা। কেয়ামতের যে বড় বড় আলামত রয়েছে তার প্রতি ঈমান আনয়ন। মানুষ দুনিয়াতে ছোট বড় যত ভালো ও খারাপ কাজ করেছে তার হিসাব নেওয়া হবে। জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। পরকালের জীবন হবে অন্তহীন যার শুরু আছে শেষ নাই।

তাকদীরের প্রতি ঈমানঃ

তাকদীর বলা হয় আসমান জমিন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহতালা কর্তৃক তার পূর্ব জ্ঞান অনুসারে তার সৃষ্টি জগতে যা হবে তা নির্ধারণ করা। দলীলঃ আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী।"[সূরা ক্বমর-৪৯]

তাকদিরের প্রতি ঈমান আনার চারটি স্তর রয়েছে।

ঙ অস্তিত্ব সম্পূর্ণ, অস্তিত্বহীন, সম্ভব এবং অসম্ভব সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান থাকা এবং এসব কিছু তার জ্ঞানের আওতাভুক্ত থাকা।সুতরাং যা ছিল এবং যা হবে, আর যা হয়নি, যদি তা হতো তাহলে কি রকম হতো তাও তিনি জানেন ।

ঙ বিশ্বজগতের সূচনা লগ্ন হতে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে বা ঘটবে সে সবকিছু মহান আল্লাহ কর্তৃক লিখে রাখা। দলিলঃ আল্লাহ বলেন,"আমরা প্রত্যেক জিনিস এক সৃষ্ট কিতাবে লিখে রেখেছি"[সুরা ইয়াসিন- ৩৬]

ঙ "আল্লাহর ইচ্ছা, তিনি যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না, আল্লাহ বলেন, সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোন ইচ্ছাই করতে পারো না।চ[সূরা তাকবীর ২৯]

ঙ আল্লাহ কর্তৃক যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করা ও অস্তিত্বে আনা এবং এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতা থাকা। কেননা তিনিই পবিত্র সত্তা। যিনি সমস্থ কর্মী ও তার কর্ম প্রত্যেক নড়াচড়াকারী ও তার নড়াচড়া এবং যাবতীয় স্থিরিকৃত বস্তু ও স্থিরিতার সৃষ্টিকারক। আল্লাহ বলেন- "আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা ও সবকিছুর কর্ম বিধায়ক।চ[সূরা যুমার ৬২]

তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্মকেও।চ[সূরা সাফফাত-৯৬]

তাকদিরের প্রতি ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এ চারটি স্তরের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। যে কেউ তার সামান্য ও অস্বীকার করবে তাকদিরের প্রতি তার ঈমান আনা পূর্ণ হবে না।

আত্মশুদ্ধির উপায়

আত্মশুদ্ধি শব্দের দুইটি অংশ রয়েছে। ১. আত্মা তথা অন্তর, ২. শুদ্ধি তথা পরিশুদ্ধ করা। যেমন আমরা পানিকে ফুটিয়ে বা ফিল্টারে পরিশুদ্ধ করে আমরা পান করি। তাহলে প্রশ্ন উঠে আত্মশুদ্ধি কি.? আত্মশুদ্ধি হচ্ছে অন্তরকে শিরক ও কুফরি তথা সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। আর ভালো ও কল্যাণকর কাজের দিকে ধাপিত হওয়া। এককথায় আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সকল নির্দেশ মেনে চলা।

<u>আত্মশুদ্ধি কেন গুরুত্বপূর্ণঃ</u>

অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, পরিশুদ্ধ অন্তরই সঠিক পথে অবিচল থাকতে পারে। আর যে সঠিক পথের উপর চলবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ সে নিশ্চয়ই সফল হচ্ছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে, আর সে ধ্বংস হয়েছে যে নিজেকে কুলষিত করেছে। (আশ শামছ- ৯/১০)

<u>আত্মশুদ্ধির উপায় কি কিঃ</u>

১. তাওহীদ শিক্ষা। আত্মশুদ্ধির প্রধান পদ্বতি হলো তাওহীদ শিক্ষা করা। তাওহীদ ৩ প্রকার।

ক. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহঃ আল্লাহ কে সকল কিছুর স্রষ্টা, পরিচালক, রিজিকদাতা হিসেবে মেনে নেওয়া।

খ. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহঃ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, তার নামে মানত করা, এককথায় আল্লাহর সামনেই মাথানত করা।

গ. তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাতঃ আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. কুরআন তেলাওয়াত করা, অর্থ অনুধাবন করা, আল্লাহ কি বলছেন তা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা। আল্লাহ বলেন; "তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ।" (মুহাম্মদ ২৪)

কুরআন নিয়ে কেন গবেষণা করবো.? কারণ হচ্ছে কুরআন সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন; নিশ্চয় কুরআন হেদায়াত করেন সেই দিকে যা সবল ও সঠিক। এবং সৎকর্মপরায়ন মুমিনদের সুসংবাদ দেয় যে তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। (বনী ইসরাইল ০৯)

৩. রসুলকে ভালোবাসা ও তাঁর অনুসরণ করাঃ রসুল হচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। তিনি মানুষকে সঠিক পথ দেখান, কল্যানকর কাজের আদেশ করেন। অসৎ ও ভূল পথ থেকে মানুষকে সতর্ক করেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন; "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদেরমধ্যে থেকে তাদের কাছে রসুল পাঠিয়েছেন। যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাঁদের নিকট তেলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন ও তাদের কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা আগে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।" (ইমরান ১৬৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন; "রসুল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।" (হাশর -৭)

৪. অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। কেননা আল্লাহ না চাইলে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন; হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। আর কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীন ও মন্দ কাজের আদেশ দেয়। আর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতো না, তবে আল্লাহ যাকে চান পরিশুদ্ধ করেন, আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

৫. ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চাওয়াঃ অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া। কেননা আমরা আমাদের কাজ কর্মে কথা বার্তায় নানাভাবে ভুল করে থাকি। রসুল সা. বলেন; "কোন ব্যাক্তি যদি পাপ করে ফেলে, অত:পর সুন্দর করে অযু করে, তারপর দুরাকাত নামাজ আদায় করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তাহলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দেন।" (আহমদ)

আল্লাহ তা'আলার ২৫টি নাম ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

১. الله

আল্লাহ- (অর্থঃ উপাস্য, মাবুদ)

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নাম মূলত আল্লাহ দিয়েই শুরু হয়, এটি একটি মৌলিক নাম, এর সাধারণ অর্থ নেই। তবে কিছু ব্যাক্তি এর অর্থ হিসেবে উপাস্য বা মাবুদ ব্যাবহার করে থাকেন। আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তাকে আমরা সবচেয়ে বেশি এই নামেই ডাকি। মহান আল্লাহ তা'আলা সেই স্বত্বা, যিনি সমগ্র বিশ্বজাহান পরিচালনা করে থাকেন।

পবিত্র কুরআনে এই নামটি ২৭২৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ ত্বোয়াহ/২০:১৪

إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

অনুবাদ: "আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। অতএব আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।"

২. الرب

আর রব - (অর্থঃ প্রতিপালক)

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মহান আল্লাহর ক্ষমায় সমগ্র বিশ্ব জাহান পরিচালিত হয়। তিনি কাকে সুপথ দেখাবেন কাকে দেখাবেন না তা সম্পূর্ণ তারই উপর। তাঁর এই নাম দিয়ে বুঝা যায় তিনিই একমাত্র সারা বিশ্বের প্রতিপালক। তিনি সারা পৃথিবীর একমাত্র পূর্ণ অবিভাবক।

পবিত্র কুরআনে এই নামটি ৯০০ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আল ফাতিহা/১:২

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অনুবাদ: "সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ'র ই।"

৩. الرحمن

আর রহমানু (অর্থঃ পরম করুনাময়)

এই নামের তাৎপর্য হলো তিনি মানব-জ্বীন সহ সকল সৃষ্টির প্রতিই করুণাশীল। বান্দা ভালো বা মন্দ যাই করুকনা কেন, তিনি সবার প্রতিই করুণা করে থাকেন। আমরা সবসময়ই তার দয়ার প্রতি নির্ভরশীল। তিনি না চাইলে আমরা কেউ পৃথিবীতে বাসবাস করতে পারতাম না। আমরা যা অর্জন করি, সবই তাঁর করুণার অংশ।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৫৭ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আল ফাতিহা/১:৩

الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

অনুবাদ: "যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।"

৪. الرحيم

আর-রহীম (অর্থঃ অসীম দয়ালু)

মহান আল্লাহ সবসময়ই তার সৃষ্টির প্রতি দয়াশীল। তিনি সৃষ্টর প্রতি অসীম দয়ালু। তিনি তার দয়ার জন্য সারা পৃথিবীর সকল ভালো মন্দ সবাইকে সমান অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন। বান্দা তাঁর হুকুম স্বীকার করুক বা না করুক তিনি কখনো কারো রিজিক নির্দিষ্ট সময়ের আগে বন্ধ করে দেন না। মহান আল্লাহর এই নামটি তাঁর অসীম দয়ার বিষয়টিই বুঝায়

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ১২৩ বার উল্লেখিত হয়েছে। যেমনঃ সূরা মুজাম্মিল ৭৩/২০

"اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيم

অনুবাদ- "নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

৫. الحى

আল হাইয়ু -(অর্থঃ চিরঞ্জীব)

সকল সৃষ্টই মরণশীল। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাধ গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র মহান আল্লাহ চিরস্থায়ী। যার কোন মৃত্যু নেই। মহান আল্লার জীবন সর্বদিক থেকেই পরিপূর্ণ। যার কোন শেষ নেই। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব কখনো শেষ হবার নয়। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন এবং চিরকাল থাকবেন।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ০৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূরা বাকারাহ ২/২৫৫

"اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم

অনুবাদ- "আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।"

৬. القيوم

আল কইয়ুম-(অর্থঃ চিরস্থায়ী)

মহান আল্লাহ সকল দিক থেকেই একক ভাবে সয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি চীরকাল এরকমই থাকবেন। তার অস্তিত্বের শেষ নেই। সমগ্র সৃষ্টি তার কাছে মুখাপেক্ষী। তার অস্তিত্ব বা ক্ষমতার মাঝে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তাঁর সকল ক্ষমতাই চিরস্থায়ী, যা কখনো শেষ হবার নয়।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৩ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূরা বাকারাহ ২/২৫৫

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم

অনুবাদ- "আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।"

৭. القدوس

আল কুদ্দুস (অর্থঃ পূত পবিত্র)

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন সকল প্রকার ভুল, ত্রুটি, দূর্বলতা, চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি বিষয় থেকে পবিত্র। তাঁকে কোন অপবিত্রতা স্পর্শ করতে পারে না। তিনি সকল চাওয়া পাওয়া, আশা- আকাঙ্খা সকল কিছু থেকেই পবিত্র। তাঁর মাঝে দুনিয়ার কোন কিছু প্রভাব বিস্তার লাভ করতে পারেনা।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আল হাশর/৫৯:২৩

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّر

অনুবাদ: "তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত।"

৮. السلام

আস সালাম (অর্থঃ শান্তি দাতা)

সকল জাতীর মাঝে কে কতটা রহমত পাবে, কে কতটা শান্তিতে থাকবে বা কষ্ট ভোগ করবে তা সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। সালাম অর্থ শান্তি। তিনিই কোন ব্যাক্তিকে দুনিয়ায় এবং আখেরাতে শান্তি প্রদান করেন এবং করবেন। আর যাকে খুশি অশান্তিতে রাখবেন। এই ক্ষমতা অন্য কারো কাছে নেই।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ১ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আল হাশর/৫৯:২৩

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّر

অনুবাদঃ "তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত।"

৯. المؤمن

আল মুমিন (অর্থঃ সত্যবাদী/ নিরাপত্তাদানকারী)

মহান আল্লাহ তাওহীদের প্রমাণাদি, তার সম্পর্কে, তার সৃষ্টি, প্রেরিত নবি- রসুল সহ সকল বিষয়ের সত্যায়ন করেছেন। তিনি বিভিন্ন শরিয়তী বিধিবিধান দিয়ে আমাদের নিরাপত্তা দান করেছেন। তিনি নবী রসুলদের মাধ্যমে পরকালের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন, যাতে আমরা পরকালেরও নিরাপত্তা লাভ করতে পারি। আর নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে মহা সত্যবাদী।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ১ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আল হাশর/৫৯:২৩

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

অনুবাদঃ "তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত।"

১০. الحق

আল হাক্ক (অর্থঃ মহা সত্য

মহান আল্লাহর অস্তিত্বর উপর কোন সন্দেহ নেই। তিনি আছেন এবং তিনিই সকল সার্বভৌমত্বের অধিকারকে অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনিই চিরন্তন সত্য। তিনি বাদশাহ, মালিক, মাবুদ স্রষ্টা হিসেবে সত্য। তার বিধান সত্য। তাঁর সিদ্ধান্ত, ওয়াদা, শরিয়ত সকল কিছুই সত্য। তাঁর মাঝে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ১০ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূরা ত্বহা ২০:১১৪

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

অনুবাদঃ "আল্লাহ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি।"

১১. العظيم

আল আজীম (অর্থঃ সুমহান)

মহান আল্লাহর মাঝে সকল প্রকার মর্যাদা, অহংকার, মহত্ত্ব সন্নিহিত রয়েছে। তিনি নামে, গুণে, কর্মে সব দিক থেকেই সবচেয়ে মহান। তিনি ব্যাতিত আর কেউই সকল মর্যাদার প্রাপ্য নয়। তিনি সৃষ্টির প্রতি তাঁর অসীম দয়া প্রকাশের মাধ্যমে নিজের মহত্ত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তারাও পৃথিবীতে সমান অধিকার নিয়ে বেঁচে আছে, যা মহান আল্লাহর অসীম মহত্ত্বেরই প্রমাণ।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৯ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূরা বাকারা ২:২৫৫

وَ لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অনুবাদ- "ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।চ

১২. الكبير

আল কাবির (সুবিশাল)

মহান আল্লাহ সত্তাগত, কর্মগত সক সকল দিক থেকেই সবার থেকে বড়। তার সমতুল্য আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। তিনিই এই সুবিশাল সৃষ্টি জগতের একমাত্র প্রতিপালক। তাঁর বিশালতা ও ক্ষমতার জন্যই আমরা এই দুনিয়ায় নিরাপদ ভাবে জীবনযাপন করছি। তিনি তাঁর ক্ষমতা দিয়ে আমাদের যাবতীয় চাহিদা পূরণ

করছেন।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৬ বার উল্লেখ করা

হয়েছে। যেমনঃ আর রা'দ/১৩:৯

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَال

অনুবাদ: "যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।চ

১৩. الطيف

আল লাতিফ (অর্থঃ অতি সূক্ষ্ম)

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সৃষ্টি এবং তিনি অতিসূক্ষ্ম। তার মাঝে সামান্যতম কোন ভুল ত্রুটির কোন অবকাশ নেই। তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে অতি সূক্ষ্ম ভাবে সকল দয়া ও রহমত ছড়িয়ে দেন। তাঁর জ্ঞান এতোটাই সুক্ষ্ম যে পাথরের ভেতরেও তিনি প্রাণকে জীবিত রাখেন। সমুদ্রের হাজার হাজার মিটার নিচেও জীবন ও রিজিক প্রদান করেন।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৭ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আল আনআম/৬:১০৩

لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير

অনুবাদ: "দৃষ্টি তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না; কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।চ

১৪. العليم

আল আলিম (অর্থঃ মহা জ্ঞানী)

এমন কোন কিছু নেই যেটা আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে। সৃষ্টির মাঝে যত কিছুর অস্তিত্বই আছে তা আল্লাহর জ্ঞানের অধিনে। তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী। তার কাছে গোপনীয়তা বলতে কিছু নেই। দুনিয়ার যেখানে যা হোক, সেটা বড় হোক আর অতী সুক্ষ্ম হোক, তবুও সেটা আল্লাহর জ্ঞানের অধিনে। আর মহান আল্লাহ তা'আলায় একমাত্র যিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ১৭০ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূরা আনয়াম- ৬:৭৩

عَلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِير,

অনুবাদঃ "অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময় সবিশেষ অবহিত।চ

১৫. المالك

আল মালিক (অর্থঃ শাসনকর্তা)

আকাশ মন্ডলী, ভূপৃষ্ঠ এবং এর মাঝে যা কিছু আছে সব কিছুর একমাত্র প্রকৃত মালিক আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তাঁর উপর অন্য কারো কর্তৃত্ব নেই। তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক। সৃষ্টি জগতের সকল ক্ষমতায় একমাত্র তাঁরই। বাদশাহ ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী হিসেবে একমাত্র তিনিই স্বীকৃত। আর মালিক শব্দ দ্বারা বুঝায় তাঁর সাম্রাজ্য সুবিশাল ও সুবিস্তীর্ণ।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৭ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আল ক্বামার/৫৪:৫৫

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِر

অনুবাদ: "যোগ্য আসনে, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহর সান্নিধ্যে।চ

১৬. الحميد

আল হামিদ (অর্থঃ প্রশংসীত)

মহান আল্লাহ সারা বিশ্বের অধিপতি। তিনি একমাত্র যিনি সকল প্রশংসার যোগ্য। তার সকল কথা, কাজ, আদেশ, সিদ্ধান্ত সবই প্রশংসনীয়। মহান আল্লাহ তা'আলায় সকল প্রশংসার একমাত্র হকদার। তাঁর আইন কানুন, সিদ্ধান্ত সকল কিছুই প্রশংসার অধিকারী। কেননা গুণ বৈশিষ্ট্যর মাঝে তিনিই একমাত্র পূর্ণতার অধিকারী এবং তাঁর দয়া অপরিসীম।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ১৭ বার উল্লেখ করা হয়েছে।যেমনঃ সূরা হুদ ১১:৭৩

"إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيد

অনুবাদঃ "নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত, মহা মর্যাদাবান।

১৭. الخبير

আল খবির (অর্থঃ সকল বিষয়ে খবর রাখেন যিনি)

এই পৃথিবীতে যে সকল কিছু গোপন বা প্রকাশ্য মান আছে সকল কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তিনি সকল ভালো মন্দের খবর জানেন। তাঁর থেকে কোন কিছু লোকানো সম্ভব নয়। পৃথিবীতে ঘটমান বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত সকল কিছুই তিনি জানেন। দুনিয়ার সকল রহস্য তাঁর কাছে উন্মুক্ত। তিনি একমাত্র সকলের অন্তর ও অদৃশ্যের প্রতি খবর রাখেন। সকল বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণ।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৪৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূরা তাহরীম ৬৬:০৩

قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيرِ

অনুবাদ: "নবী বলিল, আমাকে অবহিত করিয়াছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।"

১৮. العزيز

আল আজীজ (অর্থঃ মহা পরাক্রমশালী)

মহান আল্লাহ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, চির বিজয়ী। সারা দুনিয়ার যত শক্তি রয়েছে সবাই তাঁর শক্তির কাছে পরাস্ত। সকল সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার কাছে মাথানত করতে বাধ্য। বিশ্বের যত শক্তি বিদ্যমান আছে সকলকেই একমাত্র মহান আল্লাহর কাছে মাথা নত করতে হয়। মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা আর কারো নেই। তিনি যা স্থীর করবেন সেটাই চলমান হতে থাকবে।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৯২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূরা বাকারা ২/২৬০

وَ اعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيم

অনুবাদঃ

"আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

১৯. القدير

আল ক্বদীর (অর্থঃ সর্বশক্তিমান)

মহান আল্লাহ তা'আলা যেটাই ইচ্ছা করেন, সেটাই করতে সক্ষম। আসমান জমিনের কোন শক্তি তাঁকে কোন বাধা দিতে পারে না। তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান এবং পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন যা ইচ্ছা হয় সেটাই করে থাকেন। আমরা তাঁরাই শক্তিতে জীবনধারণ করছি। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে আমাদের জীবন চলমান রাখতে পারছি। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা একমাত্র পরিপূর্ণ শক্তির অধিকারী।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৫৭ বার উল্লেখ করা এই নামা নামটি হয়েছে। যেমনঃ আল মায়িদাহ/৫:১২০

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

অনুবাদ: "আসমান ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"

২০.الخليق

আল খলিক (অর্থঃ স্রষ্টা)

এই সুবিশাল সৃষ্টি জগতে যা কিছু অস্তিত্বমান/লোকায়িত আছে সকল কিছুই একমাত্র মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি সকল কিছুই কোন নমুনা ছাড়াই নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির মাঝে কোন ভুল বা ত্রুটির কোন অবকাশ নেই। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা ব্যাপক ও অত্যন্ত সুক্ষ্ম, সুনিপুণ। তিনি সকল কিছু সৃষ্টির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমরা যা কিছু দেখি সবটাই আল্লাহর সৃষ্টির ক্ষুদ্র নমুনা মাত্র। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আল হিজর/১৫:৮৬

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيم

অনুবাদ: "নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।"

২১.الوالى

আল ওয়ালী (অর্থঃ অবিভাবক)

সমগ্র দুনিয়া মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের সকলের অবিভাবক, আমাদের সকলের সাহায্যকারী, তিনিই আমাদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন। সারা দুনিয়া শুধু তারই দায়িত্বে এবং হুকুমেই চলে। তিনি ঈনানদারদের জন্য বিশেষ অভিভাবকত্ব পালন করেন, যার জন্য মুমিনরা দুনিয়ায় নিরাপত্তা লাভ করেছে।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ১৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূরা শূরা ৪২/২৮-

وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيد

অনুবাদ- "তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসিত।"

২২.الوكيل

আল ওয়াকীল (অর্থঃ দায়িত্বশীল, কার্য সম্পাদনকারী)

মহান আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের অভিভাবক। তিনি সারা দুনিয়ার সার্বিক দায়িত্বশীল। তিনি সকলের খাদ্য বস্ত্র সহ যত প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রয়োজন, সবই প্রদান করেন। তিনি নিজ অনুগ্রহে সবাইকে বেঁচে থাকার তৌফিক দেন। মহান আল্লাহর কাছে কেউ সাহায্য

প্রার্থনা করলে তিনি নিজ দায়িত্বে তাকে সাহায্য করেন। তিনিই মানব জাতীকে নানান অনিষ্ট হতে রক্ষা করেন এবং উত্তম জীবিকা দান কর্ন।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ১৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূরা নিসা ৪/৮১

وَ كَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلًا

অনুবাদ- "এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা কর; কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

২৩.الصمد

আস সমাদ (অর্থঃ অমুখাপেক্ষী)

মহান আল্লাহ তা'আলা সকল ক্ষমতার মালিক। তিনি কারো অনুগ্রহের প্রতি নির্ভরশীল নয়। সকল বিপদে তিনি আমাদের সাহায্য করেন কিন্তু তাঁর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। দুনিয়ার যত শক্তি আছে সবাই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আল্লাহ কারো উপর নির্ভরশীল নন। তাঁর অস্তিত্ব ও তাঁর ক্ষমতা নিয়ে কোন প্রশ্ন থাকেনা। তিনি একক ইলাহ। তাঁর সমকক্ষ কোন সময় কেউ হতেও পারবে না।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ১ বার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ইখলাস ১১০/০২-

اَللّٰهُ الصَّمَد

অনুবাদ- "আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষি নন।"

২৪.الرزاق

আর রাজ্জাক (অর্থঃ রিজিক দাতা)

আমাদের যত ধরনের চাহিদা, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ইত্যাদি সকল কিছুই আমাদের মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন প্রদান করে থাকেন। তিনি সকল সৃষ্টির মাঝে বেঁচে থাকার সকল উপকরণ দিয়ে থাকেন। তিনি কাউকে ধনী বা কাউকে গরীব জীবন দিয়ে থাকেন। রিজিক বলতে শুধু খাদ্য বস্ত্রই নয়, আমাদের বেচে থাকার জন্য, শিক্ষা-বিনোদন বা মনোরঞ্জন করার জন্য যা প্রয়োজন তা মহান আল্লাহ আমাদের দান করেন।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ সূরা মাইয়েদা ৫/১১৪-

وَ ارْزُقْنَا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّزِقِين

অনুবাদ- "আর আমাদেরকে জীবিকা দান কর; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।"

المبين.২৫

আল মুবিন (অর্থঃ সত্য প্রকাশকারী)

মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত। মহান আল্লাহর কাছে কোন গোপনীয়তা নেই। তিনি সবই জানেন। তিনি ইচ্ছা করলেই যেকোন কারো গোপনীয়তা প্রকাশ করতে পারেন। তিনি সবসময় মিথ্যা কে পরাজিত করে সত্যকে বিজয়ী করেন। তিনি সর্বদা মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যকে বিজয়ী করেন। তিনি সৃষ্টি জগতের সামনে সত্যকে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে সবাই তা বুঝতে পারে।

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই নামটি পবিত্র কুরআনে ১ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আন নূর/২৪:২৫

يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

অনুবাদ: “সেই দিন আল্লাহ তাহাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে, আল্লাহ সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক।”

যাকাতের হিসাব বের করার নিয়ম

যাকাতের হিসাবের জন্য দুইটি শর্ত-

র. নিসাব পরিমাণ সম্পদ হতে হবে

রর. এক বছর অতিক্রম হতে হবে (হিজরি/আরবী ক্যালেন্ডারে হিসাব করতে হবে)

র. নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া:

এক্ষেত্রে যদি কেউ ৭.৫ ভরি বা ৮৭.৪৮ গ্রাম স্বর্ণের মালিক হয় যার বর্তমাণ বাজার মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা (২২ ক্যারেট স্বর্ণের হিসেবে)

অথবা যদি কেউ ৫২.৫ ভরি বা ৬১২.৩৬ গ্রাম রৌপ্যের মালিক হয় যার বর্তমান বাজার মূল্য সত্তোর হাজার টাকা (২২ ক্যারেটের হিসাবে)

অর্থাৎ কোন ব্যাক্তি যদি ৭.৫ ভরির সমপরিমাণ স্বর্ণ অথবা ৫২.৫ ভরি পরিমাণ রৌপ্যের মালিক হয় তাহলে সেই ব্যাক্তির যাকাত আদায় করতে হবে এক্ষেত্রে কেউ চাইলে রৌপ্যের হিসেবে এবং কেউ চাইলে রৌপ্যের হিসেবে যাকাত আদায় করতে পারে এক্ষেত্রে সকলেই স্বাধীন । তবে গরিব মীসকিনদের হকের কথা মাথায় রাখলে রৌপ্যের হিসেবে যাকাত আদায় করা বেশি শ্রেয় ।

রর. এক বছর সময় অতিক্রম হওয়াঃ

যেদিন কোন ব্যাক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে সেই দিন থেকে এক চন্দ্র বছর পর পর যাকাতের হিসাব করতে হবে ।

সব রকমের যাকাতযোগ্য সম্পদ আলাদা আলাদা ভাবে এক বছর অতিক্রম হওয়া লাগবে বিষয়টা এমন নয় । বরং নিসাব পরিমাণ হওয়ার পর যেকোন যাকাতযোগ্য সম্পদ এক বছর অতিক্রম করলে সকল যাকাতযোগ্য সম্পদের উপরে যাকাত ফরজ হয় ।

অর্থাৎ কেউ যদি আজকে স্বর্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে নিসাব্ব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তাহলে আজ থেকে ঠিক এক বছর পর যত সম্পদ হবে সব সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে এবং যদি পরবর্তী বছর নিসাব ছুটে যায় তাহলে পুনরায় নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে সেই দিন থেকে আবার এক চন্দ্র বছর পর পর যাকাতের হিসাব করতে হবে ।

বছরের মাঝে নিসাব কম-বেশি হওয়া ধর্তব্য নয় , হিসাবে তারিখে নিসাব থাকলেই হবে । অর্থাৎ যেই দিন থেকে যাকাতের হিসাব গণনা শুরু হবে সেই দিন থেকে ঠিক এক চন্দ্র বছর পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয় ।

মৌলিক যাকাতযোগ্য সম্পদ

১। আবাদি জমির উপর কোন ট্যাক্স / যাকাত ইসলামে নেই । আবাদি জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাত দিতে হয় ।

২। ব্যাবসায়িক সম্পদ

৩। স্বর্ণ ও রৌপ্য অথবা এদের পরিবর্তে ব্যাবহৃত যেকোন মূদ্রা (টাকা , ডলার , বিটকয়েন)

৪। পশু , প্রাণী বা চতুষ্পদ জন্তু । এগুলোর উপর নির্ধারিত হিসাবে যাকাত ফরজ হয় ।

স্বর্ণ , রৌপ্য ও টাকার উপর যাকাত বের করার নিয়মঃ

র. ব্যাবহৃত বা অব্যাবহৃত স্বর্ণ

রর. নগদ ও জমানো অর্থ

ররর. পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকম কর্য দেওয়া টাকা বা সম্পদ ।

বাসাবাড়ির যে সকল সম্পদ যাকাতযোগ্য নয় >

র. ব্যাবহৃত যানবাহন

রর. ব্যাবহৃত যানবাহন

ররর. বসবাসের বাড়ি

ব্যাবসায়িক সম্পদের মধ্যে যেগুলো যাকাতযোগ্য >

র. ফ্যাক্টরির কাঁচামাল

রর. তৈরিকৃত পণ্য

ররর. তৈরির প্রক্রিয়াধীন পণ্য

ব্যাবসায়িক সম্পদের মধ্যে যেগুলো যাকাতযোগ্য নয় >

র. কোম্পানির যানবাহন

রর. কোম্পানির বিল্ডিং বা অফিস

ররর. কোম্পানির মেশিনারিজ

রা. কোম্পানির স্থায়ী সম্পদ (চেয়ার , টেবিল)

জমি , প্রোপার্টি , প্লট , ফ্ল্যাট এগুলোর ক্ষেত্রে যাকেতের নিয়ম >

র. ভাড়া দিয়ে থাকলে মূল সম্পদের উপর যাকাত লাগে না । বরং ভাড়া পেলে উক্ত ভাড়ার উপর যাকাতের হিসাব যুক্ত হবে ।

রর. ব্যাবসা করার জন্য জমি ক্রয় করলে এগুলোর যাকাত লাগে না ।

ররর. ক্রয়ের সময় ব্যাবসায়িক কোন নিয়ত না থাকলে সেই সম্পদে যাকাত প্রযোজ্য নয় ।

এভাবে যাকাতযোগ্য সম্পদ হিসাব করে সেই সম্পদের ২.৫ % সম্পদ যাকাত দিতে হবে ।

যাকাত সম্পদের রক্ষা কবচ । যাকাত আদায় না করলে সম্পদের বরকত রক্ষা হয় না । যাকাত সম্পদকে বৃদ্ধি করে । যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে । যাকাত আদায় এতটা জরুরী যে , যাকাত নেওয়ার মত কেউ না থাকলে যাকাতের অর্থ ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসতে হবে । যাকাতের সম্পদ বাড়িতে রাখা গোখরা সাপ রাখার চাইতেও বিষাক্ত ও ভয়ংকর । তাই আসুন উক্ত হিসাবের আলোকে যথাযথ ভাবে নিজ নিজ সম্পদের যাকাত আদায় করি ।

হাদীসের শিক্ষা

১ম হাদীসঃ

"আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন আল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল(সা.) কে বলতে শুনেছিঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১. এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নাই ও মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল ২. সালাত কায়েম করা ৩.যাকাত প্রদান করা ৪. আল্লাহর ঘরের হজ্ব করা এবং ৫. রমযানের সিয়াম পালন করা।চ (সহীহ বুখারী হা/৮, সহীহ মুসলিম হা./২১)

হাদীসের শিক্ষা:

১. আক্বীদাহ (বিশ্বাস) ও আমলের সমন্বয়ই ইসলাম, ঈমান ব্যতীত আমল যেমন অকার্যকর, তেমনি আমল ব্যতীত ঈমান ও ফলহীন।

২. ইসলামে ইবাদতের উদ্দেশ্য আকার ও প্রকারভেদ নয় বরং এর মূল উদ্দেশ্য হলো তা পালনও এর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়।

৩. ঈমানের শাখা-প্রশাখা বহুবিধ, এখানে শুধুমাত্র ভিত্তিসমূহেরই বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা এগুলোই ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ।

২য় হাদীসঃ

"উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা(রাযিআল্লাহু আনহা) হতে বণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে আমার দ্বীনের মাঝে এমন কোন নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।চ (সহিহ বুখারী হা./২৬৯৭)

হাদীসের শিক্ষা:

১. দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক তথা দ্বীন ইসলামের সাধারণ নীতিমালা ও বিশেষ ভাষ্যের বিরোধী প্রতিটি বিদ'আত প্রত্যাখ্যাত।

২. ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ'আতের সুত্র হলোঃ কুরআন ও সুন্নাহতে অনুল্লেখিত বিষয় যা মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে পালন করে থাকে তা প্রত্যাখ্যাত।

৩. কথা, কাজ ও বিশ্বাসে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিরোধীতার ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

৩য় হাদীসঃ

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ "অনর্থক/অহেতুক অপ্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করাই একজন ব্যক্তির উত্তম ইসলামের নিদর্শন।চ -হাদীসটি হাসান (তিরমিযী হা/২৩১৮, ইবনে মাজাহ্ হা./৩৯৭৬)।

হাদীসের শিক্ষা:

১. অনর্থক অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যাপৃত থাকা দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।

২. অপ্রয়োজনীয় বিষয় হতে বিরত থাকাতেই মুসলিমের সফলতা, কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিহিত।

৩. কল্যাণকর/মঙ্গলজনক কাজে ব্যস্ত থাকা ও অপ্রয়োজনীয়, নিষ্ফল ও হীন কাজ হতে দূরে থাকা আদর্শ মুসলিমের উত্তম গুণাবলীর নিদর্শন।

৪র্থ হাদীসঃ

কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করে যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।

আবু হামযাহ আনাস বিন মালিক (রা.) রাসূল (সা.)-এর খাদেম হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ পুর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (সহীহ বুখারী হা./১৩, সহীহ মুসলিম হা./৪৫)

<u>হাদীসের শিক্ষা:</u>

১. মুসলমানদের প্রতি কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। তাদের (মুসলমানদের) অবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। এটা ইসলামী নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা মুমিনগণ একে অপরের ভাই। তাই বিশেষ প্রয়োজনে ভাইকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

২. হিংসা ও বিদ্বেষ বর্জনে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। হিংসা-বিদ্বেষ পূর্ণ ঈমান অর্জনে প্রতিবন্ধক।

৫ম হাদীসঃ

আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস ব্যক্তির উত্তম কথা বলা উচিত।

আবু হুরাইরা (প্রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তার হয় উত্তম কথা বলা উচিত, নতুবা চুপ থাকা উচিত। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে তার আপন প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া উচিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে তার আপন অতিথিকে সম্মান করা উচিত।" (সহীহ বুখারী ৬০১৮, সহীহ মুসলিম ৪৭)

<u>হাদীসের শিক্ষা:</u>

১. উত্তম কথা বলা নতুবা চুপ থাকা পূর্ণ ঈমানের লক্ষণ।

২. প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ও অনুগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান, তাদের কল্যানে এগিয়ে আসা এবং তাদের কষ্ট দূর করা ঈমানের লক্ষণ।

৩. অতিথির সম্মান করা, ইসলামী শিষ্টাচারের অন্যতম দিক।

৬ষ্ঠ হাদীসঃ

আবু আব্দুর রহমান আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললঃ "আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি (সা.) বললেনঃ রাগ করো না। লোকটি বার বার রাসূলের কাছে উপদেশ চাইলো আর রাসূল (সা.) বললেনঃ রাগ করো না।চ (সহীহ বুখারী হা/৬১১৬)

হাদীসের শিক্ষা:

১. ক্রোধ অনিষ্টের মূল, এর থেকে বিরত থাকা কল্যাণের মূল।

২. সহনশীলতা ও আত্মার সংযম, সফলতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পাথেয় স্বরুপ।

৩. উপদেশ ও কল্যাণের ব্যাপারে মুসলমানদের আগ্রহ।

৭ম হাদীসঃ

যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর।

আবু যার জুনদুব বিন জুনাদাহ ও আবু আব্দুর রহমান মু'আয বিন জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেনঃ রাসূল(সা.) বলেছেনঃ "তুমি যেখানে যে অবস্থায় থাক আল্লাহকে ভয় কর, এবং প্রত্যেক মন্দ কাজের পর ভাল কাজ কর, যা তাকে মুছে দেবে, আর মানুষের সঙ্গে ভাল আচরণ কর।"

এ হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন ও বলেছেনঃ হাসান হাদীস। কোন কোন সংকলনে এটাকে সহীহ বলা হয়েছে। (তিরমিজী হা/১৯৮৭)

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুক্তির সরল পথ তাকওয়া, তাকওয়ার হাকীকত হচ্ছে - সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য করা, সীমালংঘন না করা, আল্লাহকে স্মরণ করা, ভুলে না থাকা, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া।

২. আল্লাহভীরু মু'মিনদের স্বভাব হলো পাপাচার হতে দ্রুত তাওবা করা এবং কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করা।

৩. পূর্ণ ঈমানের লক্ষণ হচ্ছে সৎ চরিত্র, পারস্পরিক সদাচারণ এবং উত্তম জীবন যাপন।

৮ম হাদীসঃ

তোমার যদি লজ্জাই না থাকে, তাহলে যা খুশী তা কর।

আবু মাসউদ উকবা বিন আমের আল-আনসারী আল-বদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল(সা.) বলেছেনঃ "পূর্ববর্তী নবীগনের কাছ থেকে মানুষ একথা অবগত হয়েছে যে,চ যদি তোমার লজ্জা না থাকে, তবে যা ইচ্ছা তাই করতে পার।" (সহীহ বুখারী হা./ ৩৪৮৩)

হাদীসের শিক্ষা:

১. লজ্জাহীন মানুষের নিকট কল্যাণ থাকে না।

২. লজ্জাশীলতা পুরোটাই কল্যানকর আর তা উত্তম চরিত্রের ভূষণ।

৩. লজ্জাহীন মানুষ হালাল-হারাম পার্থক্যে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন সে যা ইচ্ছা তাই করে।

৯ম হাদীসঃ

বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, অতঃপর এর উপর অবিচল থাক।

আবু আমর (যিনি আবু আমর/আবু আমরাহ নামে পরিচিত) সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ আস সাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ "হে আল্লাহর রাসূল(সা.)! আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলে দিন, যেন আপনাকে ব্যতীত অন্য কারো কাছে তা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না পড়ে। তিনি (সা.) বললেনঃ বল- আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি; অত:পর এর উপর দৃঢ় থাক।" (সহীহ মুসলিম হা/৩৮)

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসটি রাসুল (সা.)-এর অমীয় বাণী সমূহের অন্ত 'ভূক্ত। এতে ঈমান ও ইসলামের মর্মকথা বর্ণিত হয়েছে।

২. ইসলামী বিধানে অটল থাকা ইসলামের মূলনীতি সমূহের অন্যতম। উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেছেনঃ সৎ কর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধের উপরই ইসলামে অটল থাকার বিষয়টি নির্ভর করে। এটি ইসলামের সর্বোচ্চ মর্যাদার পরিচায়ক, এটি মুসলিমের পূর্ণ ঈমান ও উচ্চ প্রত্যাশার প্রমান বহন করে।

৩. আমল ব্যতীত ঈমানের দাবী বৃথা। কেননা আমল হচ্ছে ঈমানের মুখপত্র ও ফলাফল।

১০ম হাদীসঃ

আবু আব্দুল্লাহ জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা এক লোক রাসুল (সা.)-কে বললোঃ "আপনার কী অভিমত যদি আমি ফরয সালাত আদায় করি, রমযানে রোযা রাখি, হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম বলে বিশ্বাস করি এবং এর সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু যোগ না করি, তাহলে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো? তিনি (সা.) বললেনঃ হ্যাঁ।" (সহীহ মুসলিম হা./১৫)

হাদীসের শিক্ষা:

১. ফরয সমূহ পালন ও হারাম সমূহ বর্জনেই মুক্তির ভিত্তি ও জান্নাত লাভের উপায়।

২. রমযানের রোযা ও ফরয সালাত আদায়ের গুরুত্ব।

৩. ওয়াজিব সমুহ পালন ও হারাম সমূহ বর্জন জাহান্নাম হতে মুক্তির উপায়।

৪. ইসলামী বিধি-বিধান (হালাল-হারাম) সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্তব্য, যেন হেদায়েত ও আলোকিত পথে অটল থাকা সহজ হয়, হৃদয় পরিতৃপ্ত, শুদ্ধ ও আমল পরিশুদ্ধ হয়।

১১তম হাদীসঃ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছিঃ "তোমাদের কেউ অন্যায় দেখলে তা সে হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা প্রতিরোধ করবে, তাও সম্ভব না হলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এ হচ্ছে দুর্বলতম ঈমান।" (সহীহ মুসলিম ৪৯)

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নে বাতিল অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া অত্যাবশ্যকীয়।

২. ভূল ও নাফরমানীর উপর সন্তুষ্টচিত্তে অবিচল থাকা কবীরা গুনাহ। শরীয়ত গর্হিত কাজ প্রতিহত না করলে (শক্তি থাকা সত্ত্বেও) পৃথিবীতে নাফারমানী ও পাপাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে।

৩. "সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধচ কর্মসূচী বাস্তবায়নে কষ্ট স্বীকার ও ধৈর্য ধারন করতে হবে।

১২তম হাদীসঃ

ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ও ভুল ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং যে কাজে তাকে বাধ্য করা হয়েছে (তাও ক্ষমা কওে দিয়েছেন)।" (ইবনে মাজাহ্ হাদীস নং ২০৪৫, সুনানে বায়হাক্বী হাদীস নং ৭)

হাদীসের শিক্ষা:

১. সর্বশেষ উম্মতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ।

২. দ্বীনের উপর অবিচল থাকতে কষ্টের উপকারিতা, এর মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি অনুগত ও অকৃতজ্ঞের পার্থক্য করা যায়।

৩. দ্বীনের সহজতার প্রমাণ হচ্ছে, অনিচ্ছাকৃত ভূল ত্রুটি এবং অবৈধ কাজে বাধ্য হলে তার জন্য রয়েছে ক্ষমা।

১৩তম হাদীস:

তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আনীত বিষয়ে অনুগত না হবে।

আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা।) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল(সা.) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না আমার আনীত বিধানের প্রতি তার ইচ্ছা আকাংখা অনুগত হয়।" হাদীসটি হাসান সহীহ।

হাদীসের শিক্ষা:

১. একজন মুসলিমকে হতে হবে পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষ।

২. কু-প্রবৃত্তিই বিদ'আদ ও পাপাচারের উৎস।

৩. মুসলিমের যাবতীয় কর্মসূচী কুরআন ও হাদীসের মাপকাঠিতে সম্পন্ন হওয়া উচিত।

৪. সুন্নাতের অনুসরণ ও সহযোগিতা ঈমানের অপরিহার্য দাবী।

৫. রাসূলের প্রতি নিখাঁদ ভালবাসা তাঁর সুন্নাত অনুসরণের মাঝেই নিহিত।

১৪তম হাদীস:

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: "জন্মদানের সম্পর্ক যা হারাম করে, দুগ্ধপানও তা হারাম করে।" (বুখারী- হা/২৬৪৬, মুসলিম-হা/১৪৪৪)

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইসলামে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মহিলাকে বিবাহ করা

নিষিদ্ধ করেছে, তার একটি সূত্র এখানে বিবৃত হয়েছে।

২. জন্মসূত্রে যাদের সংগে বিবাহ নিষিদ্ধ দুগ্ধপানের সূত্রেও তাদের সংগে বিবাহ নিষিদ্ধ।

১৫ তম হাদীস:

উমর বিন আল-খাত্তাব (রা.) নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বলেন, "তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা করতে তবে তোমাদেরকে পাখির মতোই রিযিক প্রদান করা হতো। তারা সকালে খালি পেটে নীড় হতে বেরিয়ে যায় আর ভরা পেটে ফিরে আসে।"

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহর উপর যথার্থ ভরসা থাকলে তিনিই তার বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

২. আল্লাহর উপর যথার্থ ভরসা থাকলে আল্লাহ তাঁকে পশু-পাখির মতোই রিযিক প্রদান করবেন।

৩. আল্লাহর উপর যথার্থ ভরসা বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।

প্রাত্যহিক জীবনে রাসূল (স:) এর উল্লেখযোগ্য কিছু সুন্নাহ

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যার ইবাদত করার জন্যই, গোলাম হিসেবে আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। দরূদ ও সালাম বর্ষীত হোক, সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব, সর্ব শ্রেষ্ঠ রাসূল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর। যিনি হচ্ছেন আমাদের একমাত্র অনুকরণীয়, একমাত্র আদর্শশবান ব্যাক্তি। যার আদর্শের অনুকরণ করতে আল্লাহ তাআলা আমাদের কে বলেছেন। তিনি বলেন,

"তোমাদের জন্য তোমাদের রাসূলে মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

তাই তিনি যে আমল গুলো প্রতিদিন করতেন তার মধ্যে থেকে কিছু আমল নিচে উল্লেখ করছি।

১. রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে নিচের দোয়াটি পাঠ করতেন,

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُور

উচ্চারণ: আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।

অর্থ: "আল্লাহর জন্যেই যাবতীয় প্রশংশা জ্ঞাপন করছি যিনি আমাদেরকে(নিদ্রার মাধ্যমে) মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তার নিকট সকলের পুনরুত্থিত হতে হবে।" (বুখারী-৫/২৩৬)

২. রাসূল (স:) পেশাব ও পায়খানা যাওয়ার আগে এ দু'আ পড়তেন

بِسم اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِث.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি-আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ।

অর্থ : "আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নাপাক জ্বীন ও জ্বীন্নীর ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।" (বুখারী-১/৬৬ মুসলিম-১/২৮৩)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব ও পায়খানা থেকে পবিত্র হয়ে বের হওয়ার পরে বলতেন غُفْرَانَك

উচ্চারণ : গুফরানাকা

অর্থ : "হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা কর।" (বুখারী, আদাবুল-মুফরাদ ১০১ পৃ:)

৩. তিনি প্রতি ওয়াক্ত সালাতের আগেই মিসওয়াক করতেন,

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূল ইরশাদ করেন, "যদি আমার উম্মতের উপর কষ্ট মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক সালাতে মেছওয়াক করতে আদেশ করতাম।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস-৩৭৬)

আয়েশা (রা) বলেন: "নবী করীম যখনই নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন তখনই অযু করার পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করে নিতেন।" (আহমাদ, আবূ দাউদ)

৪. সকালের বিশেষ যিকির আযকার করা:

একদা উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া (রা) ফজরের সালাতের পর সালাতের স্থানেই বসে চাশতের সময় পর্যন্ত (অর্থাৎ ৮/৯ ঘটিকা পর্যন্ত) তাসবীহ তাহলীল করছিলেন। এমন সময় নবী করীম হাজির হয়ে বললেন : "আমি চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করেছি যার নেকী আজকের দিনের শুরু থেকে তোমার সমস্ত তাসবীহ তাহলীলের নেকীর সমান হবে।" (মুসলিম, মিশকাত ২০০, ২০১ পৃষ্ঠা) সে চারটি কালিমা হল

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه.

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাহি ওয়া-বি-হামদিহী, আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিযা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি।

৫. সকাল-সন্ধ্যায় রাসূল যে তাসবীহ পাঠ করতেন:

বিশেষ জরুরী ও উপকারী দু'আ ও তাসবীহ সমূহ উল্লেখ করা হল-

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم

উচ্চারণ: হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আলাইহি তাওয়াকওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম।

অর্থ: "আমার জন্য একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। আমি একমাত্ওপরই ভরসা করলাম। আর তিনি সুবৃহৎ আরশের মালিক।" (সূরা আত-তাওবাহ: আয়াত-১২৯)

"যে ব্যক্তি প্রতি সকাল সন্ধ্যায় সাতবার আয়াতটি পড়বে ইহকাল ও পরকালের যে বিষয়ই তাকে চিন্তাগ্রস্ত করুক তা তার সম্পর্কে যথেষ্ট হবে।" (আবূ দাউদ, যাদুল মা'আদ ২/৩৭৬ পৃষ্ঠা)

بِسمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا في السماء وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم.

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুরু মা'আ ইসমিহী শাইয়ুন ফিল আরদি ওয়া লা ফিসসামায়ি ওয়াহুয়াস সামীউল আলীম।

অর্থ: "ঐ আল্লাহর নামের সাহায্য কামন করছি যাঁর নামের বদৌলতে আসমান এবং যমীনের কোন কিছুই কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর একমাত্র তিনিই মহাজ্ঞানী ও অতি শ্রবণকারী।" (তিরমিযী, হাদীস নং-৩/১৪১)

যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় উপরিউক্ত দু'আটি তিনবার পড়বে ঐ দিনে কিংবা রাতে, কোন কিছুই তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং হঠাৎ কোন বিপদ আপদে পতিত হবে না।

নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিচের এই বাক্য গুলো সকাল,বিকাল তিনবার করেপাঠ করতেন, এবং এর ব্যাপারে তিনি উল্লেখ করেন, যে এই বাক্য গুলো সকাল,বিকাল তিনবার পড়বে,তার ওপর সন্তুষ্ট হওয়া আল্লাহ তায়ালার হক হয়ে যায়।(সুবহানআল্লাহ) দোয়াটি নিচে দেয়া হলো:

رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا-

উচ্চারণ: রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়াবিল ইসলামি দ্বীনাও ওয়াবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম নাবিয়্যা ওয়া রাসূলাহ।

৬. নিম্নলিখিত দু'আটি নবী করীম সকাল বিকাল তিনবার করে পড়তেন,

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عافني في سمعي اللهم عافني فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ من الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْت .

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা আফিনী ফী সাম্ঈ, আল্লাহুম্মা আফিনী ফী বাসারী, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল ক্ববরী। লা-ইলাহা ইল্লা আনতা।

অর্থ : "হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদ রাখ আমার দৈহিক দিক দিয়ে এবং আমার কর্ণ ও চক্ষুর ব্যাপারেও নিরাপদ রাখ। তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কুফুরী, দারিদ্র্যতা এবং কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।" (আবূ দাউদ হাদীস নং-৯৫৯)

৭. গোসলের আগে অজু করা :

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, "নবী (সা.) ফরজ গোসল করার সময় প্রথমে দুই হাত ধুতেন। অতঃপর নামাজের অজুর মতো অজু করতেন। এরপর তাঁর আঙুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। এরপর তাঁর উভয় হাতের তিন আজলা পানি মাথায় ঢালতেন এবং তাঁর সারা শরীরে পানি ঢেলে দিতেন।" (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৪৮)

৮. অজুর পর কালেমা শাহাদাত পাঠ করা :

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,তোমাদের কেউ যখন অজু করে সে যেন ভালোভাবে অজু করে।

অতঃপর বলে,আশহাদু আল্লা-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া-রাসুলুহু (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল)। তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং সে যেটা দিয়ে খুশি তাতে প্রবেশ করবে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৫৫৩)

৯. পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া :

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,নবী (সা.) এক সা (৪ মুদ) থেকে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং অজু করতেন এক মুদ দিয়ে। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২০১)

১০. অজুর পর দুই রাকাত নামাজ আদায় করা :

উসমান ইবনে আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি আমার মতো এই রকম অজু করবে, অতঃপর দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোনো খেয়াল করবে না, তাহলে তার আগের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৫৯)

১১. মাঝে-মধ্যে বৃষ্টিতে ভেজা। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৮৯৮)

১২. বৃষ্টির সময় দোয়া করা।

" صَيِّبًا نَافِعًا

অনুবাদঃ আয়েশা রা হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বৃষ্টি দেখলে বলতেন, "হে আল্লাহ্! মুষলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও।" (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১০৩২)

১৩. রাতে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে নির্জনে হাঁটা।

আয়েশা রা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখনই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে যাবার ইরাদা করতেন, তখনই স্ত্রীগণের মাঝে লটারী করতেন। এক সফরের সময় আয়িশা (রাঃ) এবং হাফসাহ (রাঃ) - এর নাম লটারীতে ওঠে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর রীতি ছিল যখন রাত হত তখন আয়িশা (রাঃ) - এর সঙ্গে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হাফসাহ (রাঃ) আয়িশা (রাঃ) - কে বললেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে, যাতে করে আমি তোমাকে এবং তুমি আমাকে এক নতুন অবস্থায় দেখতে পাবে? আয়িশা (রাঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, আমি রাযী আছি। সে হিসাবে আয়িশা (রাঃ) হাফসাহ (রাঃ) - এর উটে এবং হাফসাহ (রাঃ) আয়িশা (রাঃ) - এর উটে সওয়ার হলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়িশা (রাঃ)-এর নির্ধারিত উটের কাছে এলেন, যার ওপর হাফসাহ (রাঃ) বসা ছিলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন এবং তাঁর পার্শ্বে বসে সফর করলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সবাই অবতরণ করলেন। আয়িশা (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলেন। যখন তাঁরা সকলেই অবতরণ করলেন তখন আয়িশা (রাঃ) নিজ পা দুটি ইযখির নামক ঘাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য কোন সাপ বা বিচ্ছু পাঠিয়ে দাও, যাতে আমাকে দংশন করে। কেননা, আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - কে কিছু বলতে পারব না। [মুসলিম ৪৪/১৩, হাঃ ২৪৪৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮২৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৮৩১)

১৪. স্ত্রীর রান্না করা হালাল খাবারের দোষ না ধরা।

খেতে মন না চাইলে চুপ থাকা। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২০৬৪)

১৫. কোনো কিছু জানা না থাকলে স্বীকার করা যে, আমি জানি না। (বায়হাকি, হাদিস : ১৭৫৯৫)

১৬. মাঝে-মধ্যে বিপদে আকাশের দিকে মাথা তোলা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের কষ্টগুলো আল্লাহকে বলা। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৩১)

১৭. খুব খুশি হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়া। (মুখতাসার যাদুল মাআদ : ১/২৭)

১৮. ধোঁয়া ওঠা গরম খাবার ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত না খাওয়া। (বায়হাকি, হাদিস : ৪২৮)

১৯. করজে হাসানা (সুদবিহীন ঋণ) দেওয়া। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৮০)

২০. নফল ও সুন্নত নামাজগুলো ঘরে পড়া। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৩১)

২১. যে ব্যক্তি সকালে দশ বার ও সন্ধ্যায় দশ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত লাভ করবে। হাদীসটি সহীহ। (মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২০, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫,আল-ইখবার, পৃ. ১৫৪।)

২২. যে কোনো শব্দে সালাত আদায় করা যেতে পারে। যেমন, -

اللهم صل على محمد النبي الأمي واله وسلم

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্ম সাল্লি আলা- মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আ-লিহী ওয়া সাল্লিম।

অর্থ: "হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন উম্মী নবী মুহাম্মাদের উপর ও তাঁর বংশধর-অনুসারীদের উপর এবং আপনি সালামও প্রেরণ করুন।"

২৩. اللهم اني قد تصدقت بعرضي على عبادتك

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, ইন্নী কাদ তাসাদ্দাকতু বি ইরদী আলা ইবাদিকা।

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি আমার সম্মানকে আপনার বান্দাগণের জন্য দান করে দিলাম। সকালে ১ বার।

তাবেয়ী আব্দুর রাহমান ইবনু আজলান অথবা সাহাবী আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা কি আবু দামদামের মতো হতে পার না? সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: আবু দামদাম কে? তিনি বলেন: তোমাদের পূর্বের যুগের একজন মানুষ। তিনি প্রতিদিন সকালে এই বাক্যটি বলতেন।অন্য বর্ণনায় : তিনি বলতেন, আমাকে যে গালি দেয় আমি আমার সম্মান তাকে দান করে দিলাম। (অর্থাৎ আমার সম্মান ইচ্ছামতো নষ্ট করার অধিকার আমি তাকে দিলাম) এরপর কেউ তাঁকে গালি দিলে তিনি তাকে কিছু বলতেন না। কেউ তাঁকে জুলুম করলে বা আঘাত করলে তিনি প্রতিশোধ নিতেন না।" হাদীসটির সনদ সহীহ, তবে হাদীসটি মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।(সুনানু আবী দাউদ ৪/২৭২,আল-আযকার, পৃ. ১২৭।)

২৪. يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِيَ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

উচ্চারণ: ইয়া- হাইউ ইয়া কাইউমু, বিরাহমাতিকা আসতাগীসু, আসলিহ লী শানী কুল্লাহু, ওয়া লা- তাকিলনী ইলা- নাফসী তারফাতা ওআইন।

অর্থ: "হে চিরঞ্জীব, হে মহারক্ষক ও অমুখাপেক্ষী তত্ত্বাবধায়ক, আপনার রহমতের ওসীলা দিয়ে ত্রাণ প্রর্থনা করছি। আপনি আমার সকল বিষয়কে সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত করুন। আর আমাকে একটি মুহূর্তের জন্যও, চোখের পলকের জন্যও আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না (সর্বদা আপনার তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখুন)।"

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফাতেমা (রাঃ)-কে বলেন, "আমি তোমাকে যে ওসীয়ত করছি তা গ্রহণ করতে তোমার অসুবিধা কি? আমি ওসীয়ত করছি যে, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় এই কথা বলবে।চ হাদীসটি সহীহ।" (মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৭, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫।)

২৫. يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

উচ্চারণঃ ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব ছাব্বিত কালবী আলা দীনিকা।

অর্থঃ "হে অন্তর পরিবর্তনকারি! আমার অন্তর তুমি তোমার দীনে সুদৃঢ় রাখ।"

তিনি বলেনঃ আমি বললামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অধিকাংশ সময় এই দুআ কেন করেন যে, ইয়া মুকাল্লিবাল কুলূব ছাব্বিত কালবী আলা দীনিকা? তিনি বললেনঃ হে উম্মু সালামা! এমন কোন মানুষ নেই যার অন্তর আল্লহ তআলার অঙ্গুলীসমূহের দুই অঙ্গুলের মাঝে নেই। যাকে তিনি ইচ্ছা তাকে তিনি দিনের উপর কায়েম রাখেন, যাকে ইচ্ছা তিনি সরিয়ে দেন।

রাবি মুআয (রহঃ) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেনঃ

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

উচ্চারণ: রব্বানা লা' তুযিগ কুলুবানা বা'আদা ইয হাদায়তানা।

অর্থ: হে আমাদের রব্ব! হেদায়তের পর তুমি আমাদের অন্তর বক্র করে দিও ন (আল-ইমরান ৩ঃ ৮)।

সুনান আত তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৫১/ দুআ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত (كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ)

আল কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

সকল সংস্কৃতিতেই সাহিত্য ও কাব্য মানবিক সৃজনশীলতা ও ভাব প্রকাশের মাধ্যমে হিসেবে পরিগনিত। ইতিহাসের এক সুদীর্ঘ পর্যায় জুড়ে সাহিত্য ও কাব্যকে উচ্চ মর্যাদা ও গৌরবের আসন দেওয়া হতো। আজকের দিনে যেমন দেওয়া হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে।

মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করেন আল কুরআন আরবি সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন এবং পৃপৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আরবি সাহিত্য। এই চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে আল কুরআনে অবিশ্বাসীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এভাবে,

"আমার বান্দার প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে, সে সম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে তবে অনুরূপ (অন্তত) একটি সূরা তৈরি করে উপস্থাপন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদের ডাক,যদি তোমাদের সন্দেহ সত্য হয়ে থাকে! যদি তা না পার এবং কখনই তা পারবেনা- তবে অগ্নিকে ভয় কর- যা সত্য প্রত্যাখানকারীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে, মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন।" (আল কুরআন ২:২৩-২৪)

অবিশ্বাসীদের প্রতি আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে: তোমরা কুরআনের সূরাসমূহের মত করে অন্তত একটি সূরা তৈরি করে দেখাও। এই চ্যালেঞ্জ কুরআনে বার বার উল্লেখ কিরা হয়েছে। কিন্ত বিগত ১৪০০ বছরের অধিক হয়ে গেলেও আজ পরর্যন্ত আল কুরআনের সূরাসমূহের কোন একটির মতও সৌন্দর্য, নিশ্চয়তা,ভাবগভীরতা ও আলংকারিক শব্দচয়ন সম্বলিত কোন সূরা তৈরি করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তবে কোন ধর্মীয় গ্রন্থে যত কাব্যিক মধুরতা নিয়েই বলা হোক না কেন যে পৃথিবী 'চ্যাপ্টা'- একজন যুক্তি ও বাস্তববাদী মানুষের কাছে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এখন আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি যখন প্রজ্ঞা,যুক্তি ও বাস্তবতা সম্পৃক্ত বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে।

কাজেই আল কুরআনের অনুপম সৌন্দর্যমন্ডিত ভাষাশৈলী এর স্বর্গীয় উৎসের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবেনা। কোন ধর্মীয় গ্রন্থকে ঐশী হিসেবে দাবি করতে হলে উক্ত গ্রন্থের যুক্তি গ্রাহ্যতার শক্তিকে ভিত্তি করেই করতে হবে।

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, নোবেলজয়ী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (**অষনবৎঃ ঊরহংঃবরহ**) এর অভিমত হচ্ছে, " ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান হচ্ছে খোঁড়া এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম হচ্ছে অন্ধ"। কাজেই

আসুন আমরা কুরানের বাণী সম্পর্কে অবহিত হই এবং বিশ্লেষণ করে দেখি, এই পবিত্র গ্রন্থ আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাকি সামঞ্জস্যহীন?

আল কুরআনে কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়। এটি সংকেত বা আয়াতসম্বলিত একটি গ্রন্থ। আল কুরআনে ছয় হাজারেরও অধিক আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে এক হাজারের বেশি আয়াত বিজ্ঞান সম্পৃক্ত। আমরা এখানে আপনাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

জীবনের উৎপত্তি

কুরআন বলে, "এবং আমি প্রাণ সৃষ্টির জন্য সমস্ত জীবন্ত জিনিসকে পানি থেকে তৈরি করেছি" (সূরা আম্বিয়া ২১:৩০)। এটি একটি সহজ বাক্য যা বলে যে সব জীবন্ত জিনিস পানির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানও বলে যে জীবনের উৎপত্তি পানিতে হয়েছে এবং জীবিত সমস্ত জিনিসের জন্য পানি অপরিহার্য।

প্রথম জীবের উদ্ভব প্রায় ৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে সমুদ্রের পানিতে হয়েছিল। তখন বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান একত্রিত হয়ে প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য জৈব অণুগুলি তৈরি করে। এই অণুগুলি একত্রিত হয়ে প্রাথমিক জীবনের কোষ গঠন করে। তাই আমরা বলতে পারি যে পানি জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআনের এই আয়াতটি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। এটি প্রমাণ করে যে কুরআনে বিজ্ঞান সম্মত তথ্য রয়েছে এবং এটি আমাদের জীবন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়। ভ্রূণের বিকাশ

কুরআন মানব ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করেছে, "আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তাকে একটি শুক্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করেছি, এরপর তাকে একটি ঝুলন্ত বস্তুতে রূপান্তরিত করেছি..." (সূরা মুমিনুন ২৩:১২-১৪)। আধুনিক বিজ্ঞান ভ্রূণের বিকাশের ধাপগুলির একই ধরনের বিবরণ প্রদান করে।

ভ্রূণের বিকাশের প্রথম ধাপ হল নিষেক, যেখানে পুরুষের শুক্রাণু নারীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাইগোট গঠিত হয়, যা পরে বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহুগুণিত হয়ে ব্লাস্টোসিস্টে পরিণত হয়। এরপর, ব্লাস্টোসিস্ট মায়ের জরায়ুর দেয়ালে ঝুলে থাকে, যা কুরআনে উল্লেখিত ঝুলন্ত বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এরপর ভ্রূণটি ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধাপে বিকশিত হয়, যেখানে কোষগুলি বিভিন্ন অঙ্গ এবং টিস্যুতে রূপান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়াটি কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপে সম্পন্ন হয়, যেমন মোর্কোজেনেসিস, অসজ বিকাশ, এবং উন্নয়ন। কুরআনে উল্লেখিত ধাপগুলি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের বর্ণিত ধাপগুলি একে অপরের সাথে মিলে যায়, যা কুরআনের জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সাদৃশ্য প্রমাণ করে।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব

মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে এখনকার সময়ে বিজ্ঞানীদের যে মতবাদটি ব্যাপহারে প্রচলিত রয়েছে এবং ব্যাপক গ্রহণযোগ্য সেটা হচ্ছে, মহাবিস্ফোরণ বা **ইরম ইধহম** ঞযবড়ৎু ও

এই তত্ত্ব বিজ্ঞানী ও জ্যোতিবিজ্ঞানীদের যুগ যুগ ধরে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান ও গবেষণা ফল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সৃষ্টির আদিতে মহাবিশ্ব,গ্রহ,নক্ষত্রপুঞ্জ ছিল একটি একক বস্তুর(চৎরসধৎু ঘবনঁষধ) আকারে। অতঃপর ঘটল এক মহাবিস্ফোরণ (**ইরম ইধহম**), চৎরসধৎু ঘবনঁষধ অজস্র খন্ডে বিভক্ত হয়ে গেল এবং সৃষ্টি হলো ছায়াপথ মন্ডলী। আবার এই সব ছায়াপথ বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হলো নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহ, সূর্য,চন্দ্র ইত্যাদি। মহাবিশ্ব সৃষ্টি ছিল এক অনন্য ও সুপরিকল্পিত ঘটনা। কাজেই এই সৃষ্টি আকস্মিকভাবে ঘটেছে এমন সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই ।

বিগ ব্যাং থিওরি হল মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিস্তারের একটি মহাবিশাল ধারণা, যা বিশেষতঃ সময় ও মহাবিশ্বের মধ্যে ঘটা বিস্ফোরণের প্রথম অধ্যয়নের সাথে যুক্তিগত হয়েছিল। এই থিওরির মূল ধারণা হল যে মহাবিশ্ব একটি সিঙ্গুলারিটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, অর্থাৎ এটি অসীম গাজকতা, গতি, এবং তাপমাত্রার একটি অমূর্ত ধারণা থেকে প্রাকৃতিক ঘটনা হতে পারে।

সমস্ত পরমাণু, এবং তাদের সংগঠিত রূপ, যা আমরা আজ পর্যন্ত মহাবিশ্বে দেখতে পাচ্ছি, একটি অত্যন্ত গভীরভাবে সংক্ষিপ্ত অবস্থান থেকে এসেছে। এটি একটি সিঙ্গুলারিটির প্রথম ধারণা, অর্থাৎ এটি একটি অসীম ধারণা, যা সময়, তাপমাত্রা, এবং গাজকতা সম্পর্কে কোনো প্রাকৃতিক আলোচনায় অপরিহার্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এটির সাথে একটি অনুপাতে, যার সাথে তাপমাত্রা, গাজকতা, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক গুণগুলি একত্রিত ছিলেন, সৃষ্টির প্রস্তুতি সম্পর্কে কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা হতে পারে। বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রায় ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে একটি বিশাল বিস্ফোরণ ঘটেছিল যা মহাবিশ্বের জন্ম দেয়। এই বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট পদার্থ এবং শক্তি ক্রমশ প্রসারিত হয়ে বর্তমানে আমরা যেটা দেখতে পাই সেই বিশাল মহাবিশ্বের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেমন মহাবিশ্বের বিস্তার, মহাকাশীয় মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, এবং হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের সৃষ্টির অনুপাত।

কুরআন বলে, "যারা অবিশ্বাসী তারা কি দেখেনি যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বন্ধ ছিল, তারপর আমি উভয়কে পৃথক করেছি?" (সূরা আম্বিয়া ২১:৩০)। বিগ ব্যাং তত্ত্ব বলে যে মহাবিশ্ব একটি সিঙ্গুলারিটি থেকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং এটি ক্রমশ বিস্তৃত হয়েছে।আধুনিক বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার করা মহাবিস্ফোরক (**ইরম ইধহম**)তত্ত্ব এবং আল কুরআনের বাণীর এই আশ্চর্য সাযুজ্য সত্যিই বিস্ময়কর। ১৪০০ বছর আগে আরবের মরুভূমিতে যে গ্রন্থের আবির্ভাব ,সেই গ্রন্থে কিভাবে উচ্চারিত হলো বহু শতাব্দী পরে আবিষ্কার হওয়া বিপুল গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞনিক সত্য?

আমরা বুঝতে পারি যে আল কুরআনের ভাষ্য **ইরম ইধহম** তত্ত্বের সাথে একান্তই সামঞ্জস্যপূর্ন।। এটি প্রমাণ করে যে কুরআনে মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্য রয়েছে।

পর্বতমালা

কুরআন বলে, "আমি পৃথিবীতে দৃঢ় পর্বত রেখেছি যেন তা তোমাদের নিয়ে না কাঁপে..." (সূরা লুকমান ৩১:১০)। আধুনিক ভৌত বিজ্ঞান বলে যে পর্বতমালা পৃথিবীর পৃষ্ঠকে স্থিতিশীল করতে সহায়ক।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে পর্বতমালা শিকড়ের মাধ্যমে মাটির গভীরে প্রবেশ করে এবং পৃথিবীর ভূত্বককে স্থিতিশীল করে। এই শিকড়গুলি পৃথিবীর ভূত্বকের শক্তি এবং চাপ সামলাতে সহায়তা করে এবং ভূমিকম্পের সময় স্থিতিশীলতা প্রদান করে। এছাড়াও, পর্বতমালা প্লেট টেকটনিক্স প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ভূমিকা পালন করে, যা পৃথিবীর ভূত্বকের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে।

পর্বতমালা কেবল ভূত্বকের স্থিতিশীলতাই প্রদান করে না, বরং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ, পানি সঞ্চালন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি কুরআনের বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতার আরেকটি প্রমাণ এবং কুরআনের জ্ঞানী উপস্থাপনার পরিচায়ক।

মহাবিশ্বের বিস্তার

কুরআন বলে, "আমি মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি এটিকে বিস্তৃত করছি" (সূরা ধারিয়াত ৫১:৪৭)। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে মহাবিশ্ব ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে।

এডউইন হাবল ১৯২৯ সালে পর্যবেক্ষণ করেন যে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যা প্রমাণ করে যে মহাবিশ্ব ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। হাবল টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাবিশ্বের বিস্তার পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এটি একটি প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাবলের আবিষ্কার মহাবিশ্বের বিস্তার সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে এবং বিগ ব্যাং তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

কুরআনে ১৪০০ বছর আগে মহাবিশ্বের বিস্তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এটি কুরআনের বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতার একটি শক্তিশালী প্রমাণ এবং কুরআনের ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রতিফলন।

সূর্যের কক্ষপথ

কুরআন বলে, "সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে চলমান, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত" (সূরা ইয়াসিন ৩৬:৩৮)। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে সূর্য নিজস্ব কক্ষপথে গতি করে এবং এটি মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে পরিভ্রমণ করে।

সূর্য প্রায় ২২৫-২৫০ মিলিয়ন বছর সময় নেয় মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারপাশে একটি পরিপূর্ণ কক্ষপথ সম্পূর্ণ করতে। এই গতির ফলে সূর্য এবং এর গ্রহমণ্ডলীয় সিস্টেম গ্যালাক্সির বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে। সূর্যের এই গতি এবং কক্ষপথের নির্ধারিততা প্রমাণ করে যে এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থির নয় এবং এটি ক্রমাগত গতিশীল।

কুরআনে ১৪০০ বছর আগে সূর্যের কক্ষপথ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এটি কুরআনের বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতার একটি শক্তিশালী প্রমাণ এবং কুরআনের ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রতিফলন।

সমুদ্রের গভীরতা এবং অন্ধকার

কুরআন বলে, "অথবা তাদের উদাহরণ যারা গভীর সমুদ্রে অন্ধকারে ডুবন্ত" (সূরা নূর ২৪:৪০)। আধুনিক সমুদ্র বিজ্ঞান বলে যে সমুদ্রের গভীরে কোনো আলো পৌঁছায় না এবং সেখানে সম্পূর্ণ অন্ধকার

থাকে।

সমুদ্রের গভীরতায় আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং প্রায় ২০০ মিটারের বেশি গভীরে কোনো আলোর উপস্থিতি থাকে না। এই স্তরটিতে সম্পূর্ণ অন্ধকার বিরাজ করে এবং সেখানে জীবিত প্রাণীরাও বিশেষ অভিযোজনে সক্ষম হয়েছে। এই গভীরতায় চাপও অত্যন্ত বেশি এবং তাপমাত্রা খুবই নিম্ন।

কুরআনের এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে কুরআনে বিজ্ঞান সম্মত তথ্য রয়েছে। কুরআনে ১৪০০ বছর আগে সূর্যের কক্ষপথ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করা হয়েছে। এটি কুরআনের বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতার একটি শক্তিশালী প্রমাণ এবং কুরআনের ঐশ্বরিক জ্ঞানের প্রতিফলন।

মানুষের আঙুলের ছাপ

কুরআন বলে, "আমি তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবো এমনকি তার আঙুলের ছাপ পুনরুদ্ধার করবো" (সূরা কিয়ামা ৭৫:৪)। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে প্রতিটি মানুষের আঙুলের ছাপ অনন্য এবং এটি পুনরায় সৃষ্টি করা সম্ভব।

প্রতিটি মানুষের আঙুলের ছাপ অনন্য এবং জীবনের কোন পর্যায়েই এটি পরিবর্তন হয় না। এটি জীবনের প্রথম দিকে গঠিত হয় এবং মৃত্যুর পরেও একই থাকে। আঙুলের ছাপ মানুষের পরিচয় নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এটি অপরাধী শনাক্তকরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

কুরআনের এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে কুরআনে বিজ্ঞান সম্মত তথ্য রয়েছে।

আল কুরআনে উল্লেখিত বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যগুলোকে আকস্মিক সামঞ্জস্য (**ঈড়রহপরফবহপব**) বলে অভিহিত করা নিতান্তই সাধারণ জ্ঞান ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী।

আল কুরআনে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে চিন্তা করে দেখার জন্য মানব সমাজের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে :-

"অবহিত হও নিশ্চয়ই নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে রয়েছে প্রজ্ঞাবানদের জন্য নিদর্শন " (আল কুরআন ৩:১৯০)

আল কুরআনে বিধৃত এমন বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যাদিই প্রমাণ করে নিশ্চিতভাবে এই মহাগ্রন্থে একটি ঐশী কিতাব। ১৪০০ বছর আগে এমন একটি গ্রন্থ প্রণয়ন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়,যাতে রয়েছে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য, যা তখনকার সময়ের বহু শতাব্দী পরে আবিষ্কার হয়েছে।

তবে কুরআন কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়,এটি একটি সংকেতপূর্ণ বা ইশারাপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এই সমস্ত ইশারা মানুষকে আহবান জানায় পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের মূল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা এবং প্রকৃতিবান্ধব পরিবেশে বাস করা।

কৈশোরে/যৌবনে কিভাবে আমাদের পদস্খলন ঘটে ; মুক্তির পথ

মানব জীবনকে মোটামুটি ৬ ধাপে/ভাগে ভাগ করা যায়। ১.ভ্রুন /মাতৃকাল/ ২.শৈশব ৩ .কৈশোর ও বয়:সন্ধিকাল ৪.যৌবন ৫.প্রৌঢ় ও ৬.বার্ধক্য কাল।

একটি সুন্দর জীবন যাপন করার জন্য প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে আমাদের নূন্যতম ধারণা রাখা আবশ্যিক।

আমরা এখানে কৈশোর ও বয়:সন্ধিকাল নিয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

বলতে গেলে শিশুর বয়স ৫ বছর পর্যন্ত শৈশব কাল,৬-১০ বছর পর্যন্ত বাল্যকাল এবং ১১-১৯ বছর পর্যন্ত কৈশোর কাল।আর এ বয়সের মধ্যেই ছেলে এবং মেয়েদের বয়:সন্ধিকাল শুরু হয়।ছেলেদের থেকে মেয়েদের বয়:সন্ধিকাল শুরু হয় আগে।

শিশুদের শিক্ষা শুরু হয় ছোট্ট বয়স থেকেই।কৈশোরে পা দেয়ার আগ পর্যন্ত তাদের পৃথিবী বলতে শুধু মা বাবাকেই বুঝে। তাদের আইকন হলো বাবা মা। বাবা মায়ের আচরণ/ব্যবহার থেকে শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করে।একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো এই বয়সে তারা যে শিক্ষা পেয়ে থাকে সেই শিক্ষা গুলো প্রতিটি শিশুর সাব কনসাস তথা অবচেতন মনে গেথে থাকে। প্রতিটি শিশু যখন শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করে সাথে সাথে তার মধ্য একজন পরিপূর্ণ পুরুষ এবং নারীর বৈশিস্ট্য ধারণ করতে থাকে।এই সময়টাতে প্রতিটি ছেলে এবং মেয়ের নিজস্ব সত্তা তৈরি হতে থাকে।

এই সময়টাতে তাদের দৈহিক আকার আকৃতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে থাকে।তাদের হরমোনাল চেঞ্জ হতে থাকে।তখন বাবা মায়ের থেকে বন্ধুদের কথার গুরুত্ব বেশী দিতে শুরু করে।কথায় কথায় বাবা মায়ের সাথে তর্ক করা শিখতে থাকে।

তারা ভাল মন্দের বিচার করতে চাই না। বাবা মা বেশী শাসন করলে তাদের থেকে অনেক কিছু লুকিয়ে রাখতে চাই।৮-১০ বয়স পর্যন্ত বাবা মায়ের ভাল লাগাই তাদের ভাললাগা।তাদের পছন্দ মত সব কাজ করতেই তারা পছন্দ করে।

বাহিরের কোন মানুষ কোন পরামর্শ দিলেও শুনতে আগ্রহী নয়।বাবা ভুল করলেও সেইটাকেই তারা সঠিক মনে করে থাকে।

কিন্তু তাদের থেকে দেখা/শেখা প্রতিটি কথা এবং কাজ পরবর্তীত জীবনে খুব প্রভাব ফেলে।এটি প্রতিটি বাবা মায়ের বুঝা উচিৎ ।

কৈশোর বয়স শুরু হলে শারীরিক ভাবে যে সমস্ত পরিবর্তন আসতে থাকে,তার সাথে যখন বয়:সন্ধি যোগ হয়।তখন প্রতিটি ছেলে এবং মেয়ে ঠিক বুঝে ওঠতে পারে না কি হচ্ছে।নিজের মধ্যে এক অজানা ভয় কাজ করে।হরমোনাল কিছু চেঞ্জ যে গুলো অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

আর এটাতে লজ্জা পাবারও কিছু নেই।তাদের কে সঠিক পদ্ধতিতে বুঝাতে হবে এটা আল্লাহ তায়্যালার একটি নিয়ম। যেই নিয়ম নীতির মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে পৃথিবীতে বংশ বিস্তার করে আসছে।

লজ্জা পাবার কিছু নেই বলতে, আমরা কখনো বেহায়পনা করে কিভাবে একজন পুরুষ এবং নারী প্রাপ্ত ব্যয়স্ক হয়,সেইটা শিক্ষা দেয়াকে কখনো সমর্থন করি না।

বর্তমান কচি কচি শিক্ষার্থী ছেলে এবং মেয়ে কে একাত্র করে বয়:সন্ধি কাল শিক্ষা দেয়া হয়।কিভাবে একজন পুরুষ এবং নারী এডাল্ট হয়।যেই শিক্ষা দিতে গিয়ে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক/শিক্ষিকা একটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন।আমরা এই রকম বয়:সন্ধিকাল শিক্ষা দেয়াকে আগুনে ঘি ঢেলে দেয়ার মত মনে করি।

<u>কৈশোর/যৌবনে পদস্খনের কারণ :</u>

ধারাবাহিক ভাবে মৌলিক কিছু কারণ এবং উত্তরণের উপায় নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হলো।

<u>১.বাবা মায়ের অসচেতনতা:</u> কৈশোরে পদস্খলনের প্রথম কারণ হলো বাবা মায়ের অসচেতনতা। একজন বাবা মা হিসেবে যেই নূন্যতম মৌলিক কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন। বেশীরভাগ গার্ডিয়ানের মধ্যে সেইটা নেই।আর যাদেরকেও আমরা শিক্ষিত বলে জানি।তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়,তারা সঠিক পদ্ধতিতে বাচ্চাদের শিক্ষা না দিয়ে ভুল পদ্ধতিতে শিক্ষা দিচ্ছে।

শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করার আগে থেকেই সন্তানের সাথে বাবা মায়ের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব গড়ে তুলতে হবে।অন্যথায় সন্তান বিপথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।কারণ তারা সঠিক তথ্য না জানার কারণ ভুল পথে এই সময়টাতেই পা বাড়ায়।

আমাদের কালচারে দেখা যায়, যখন একটি মেয়ে বয়:সন্ধিকালে পৌছায়। তখন ঠিকই মায়ের কাছ থেকে প্রাথমিক বয়:সন্ধিকালের তথ্যগুলো পেয়ে থাকে।কিন্তু একজন ছেলের ক্ষেত্রে বাবা মা কারো কাছ থেকেই বয়:সন্ধি কালের সঠিক তথ্য পায় না।

সেই জন্য তারা বন্ধু, বড়ভাই এবং বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটে থেকে তথ্য গুলো খুজে বেড়াতে থাকে।

আর এই সময়টাতেই ভুল তথ্যসূত্র পেয়ে প্রাথমিক ভাবে জীবনের ভুল পথে অগ্রসর শুরু হয়।

প্রতিটি মা বাবার উচিৎ সন্তানকে জিনিস গুলো সুন্দর ভদ্র এবং আদবের সাথে শিক্ষা দেয়া। যে বয়সে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই অবগত করা।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের সমাজের কালচার হলো,গার্ডিয়ানরা লজ্জিত। তিক্ত হলেও সত্য যে,আমরা যদি সঠিক তথ্য না দেই।তাহলে আমাদের সন্তান অবশ্যই অন্য কারো কাছে যাবে তথ্যগুলো জানার জন্য।কারণ তখন কার বয়সটাই এমন। এই সময়টাতে সে সব কিছু জানার প্রবল ইচ্ছা আখাংখা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

আমাদের সমাজের আরেকটি বাস্তব চিত্র হলো, ছোট বেলাতে সন্তানের ভুল গুলোকে মা বাবা তেমন কিছুই মনে করেন না। ছোট্ট বেলাতে নৈতিকতার শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে আর তাদেরকে নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পিতা মাতার জন্য সব থেকে বড় উদাহরণ হতে লোকমান (আ:)।মহান আল্লাহ তায়ালা লোকমান (আ:) তার পুত্রকে দেয়া উপদেশ কুরআনে বর্ননা করেছেন।

লোকমান (আ.) ছেলেকে বলেন,হে বৎস, আল্লাহর সঙ্গে শরিক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা মহা অন্যায়। (সুরা লোকমান, আয়াত : ১৩)

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেও যখন সন্তানের কোন ভুল ধরিয়ে দেয়।তখন আমাদের সমাজের কিছু কিছু মা বাবা এমন ভাবে রিয়্যাক্ট করে।দেখে মনে হয় তার সন্তান কেবল আসমান থেকে নেমে আসল।

তার সন্তান যে কোন ভুল কাজ করতে পারে,এইটাই বিশ্বাস করতে পারে না।যার কারণে সন্তান সাহস পেয়ে বসে।আস্তে আস্তে পদস্খলনের ধারে এগুতে থাকে।

অপর দিকে কিছু কিছু মা বাবা সন্তান কে কড়া শাসন দিয়ে মানুষ করতে চাই।যেখানে সন্তানের চাওয়া পাওয়া, ভালা লাগার কোন অনুভূতিই কাজ করতে পারে না।সেই জন্য পরবর্তীতে সুযোগ পেলেই নানা ধরনের অনৈতিক কাজের সাথে জরিয়ে পরে।

<u>২.শিক্ষক/শিক্ষিকার নিরবতা:</u> আমরা যখন ছোট ছিলাম।তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে কোন ধরনের বেয়াদবী এবং অনৈতিক কোন কাজ করলে সাথে সাথেই অবিভাবককে অবহিত করা হত।

কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক ছাত্র/ছাত্রী অনেক ধরনের অনৈতিক কাজ করে থাকলেও।শিক্ষক মহোদয় এই জায়গায় নিরবতা পালন করে।

তার একটি বড় কারণ হতে পারে,বর্তমান সময়ে পারিবারিক নৈতিক শিক্ষার অভাব খুবই বেশী।অনেক ছাত্র আছে,যারা শিক্ষক মহোদয় কে নূন্যতম সম্মান টুকু দেয় না।ক্লাসের ভিতর ধুমপান করার মত দু:সাহস ছাত্ররা করে থাকে।কোথায় এত দু:সাহস পায়?।

স্কুল,মাদ্রাসা গুলোতে তথাকথিত প্রেমিকার অভাব নেই। কিন্তু শিক্ষক মহোদয় এই গুলো দেখেও না দেখার বান করে থাকে।অবশ্যই শিক্ষক মহোদয় কে তাদের গার্ডিয়ানকে অন্তত অবহিত করা অতীব জরুরী প্রয়োজন মনে করি।

একজন স্টুডেন্ট সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত স্কুল/মাদ্রাসাতে অবস্থান করে।সারা দিনের বড় একটা অংশ বাড়ির বাহিরে কাটিয়ে দেয়।বাড়িতে যাওয়ার পর ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের আসল মুখস ঢেকে ফেলে।এমন একটি ভাব করে ভাজা মাছ উল্টিয়ে খেতে পারে না।কিন্তু সেই ছাত্র/ছাত্রী এমন ধরনের কার্যক্রম করে থাকে;যা হয়তো তার পিতা মাতা কখনো কল্পনাও করতে পারে না।

একজন সতেচন অবিভাবক হয়তো স্কুল /মাদ্রাসাতে গিয়ে খুজ নিয়ে থাকেন।কিন্তু বেশির ভাগ অবিভাবক অসচেতন। সেই জন্য শিক্ষক মহোদয় যদি অবিভাবকদের অবহিত করেন।তাহলে অন্তত তাদের পদস্খলনের হার একটু হলেও রোধ করা সম্ভব।

হুজ্জাজ বিন আরতা তার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বলেন: "তোমাদের ৫০টি হাদীস জানার চেয়ে একটি আদব শিক্ষা করা জরুরী।" (কিতাব আল আদব আস সগীর পৃস্টা ১১)।

সালাফদের জীবনী অধ্যয়ন করলে দেখা যায়,তারা ১৮/২০ বছর পর্যন্ত আদব শিস্টিচার অর্জন করতেন।তারপর তারা জ্ঞান অর্জনের জন্য ভ্রমণ করতেন।

কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা বেশির ভাগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদবের বিন্ধুমাত্র লেশ নেই।শিক্ষকদের সাথে জগন্য আচরণ করে থাকে।আল্লাহ তাস্থালা সেই সমস্ত প্রিয় ছাত্র/ছাত্রী ভাই বোনকে সঠিক বুঝ দান করুন।

শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আরেকটি প্রসিদ্ধ ঘটনার রুপ রেখে রয়েছে। খলীফা হারুন অর রশীদ তার ছেলেকে তৎকালীন আলিম ঈমাম আসমাঈর নিকট দ্বীন শিক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছেন।

একদিন দেখতে পেলেন ইমাম আসমাঈ নিজের পা ধৌত করছেন আর খলীফা হারুন অর রশীদের ছেলে পানি ঢালছেন।

তখন খলীফা হারুন অর রশীদ বলেন: 'নিশ্চয়ই আমি তাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছি ইলম ও আদব শিখার জন্য।কেন আপনি তাকে এক হাতে পানি ঢেলে নিলেন, অন্য হাতে পা ধোত করে নিলেন না।"?

এ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে,অভিভাবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো যে, শিক্ষকদের সম্মান করার ব্যাপারে সন্তানের নসিহত করা এবং নিজেরাও সম্মান করা।(বই:ইলম অর্জনের আদব পৃসঠা ৫)ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ।

আলি রা: থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে,তিনি বলেন, একজন শিক্ষকের অধিকার হলো। তাকে বেশি প্রশ্ন করবে না, তার গোপন কিছু ফাঁস করবে না, কারো কাছে তার গীবত করবে না, তার ভুল ত্রুটি তালাশ করবে না। যদি তার কোন ভুল দেখতে পাও, তাহলে ওযর খুজবে এবং সম্মান করবে।যদি কখনো তার কোন প্রয়োজন দেখতে পাও,তাহলে তার খেদমতের জন্য সবার আগে ছুটে যাবে। (বই:ইলম জনের আদব, পৃষ্ঠা নং ৮, ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ,তাইবা একাডেমি)

সর্বোপরি শিক্ষকদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তাদের সাথে চরম বেয়াদবিপূর্ণ আচরণ করে জীবনে কখনো সুশিক্ষা অর্জন করা সম্ভব নয়।

৩.মোবাইল ফোনের অবাধ ব্যবহার: বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মোবাইল ফোন ব্যবহার ছাড়া চলা অসম্ভব। কিন্তু এই সময়ে এসে পদস্খলনের সব থেকে বড় কারণ হলো ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা।বর্তমান সময়ে প্রতিটি গার্ডিয়ান তাদের সন্তানকে ইন্টারনেটের অবাদ ব্যবহার থেকে কন্ট্রোল করতে হিমসিম খাচ্ছে।

আগের সময়ের সন্তানের পদস্খলনের অন্যান্য অনেক কারণ ছিল;এমনকি এখনও আছে।কিন্তু আজকের সমাজের যত ধরনের অনৈতিক কার্যক্রম হয়ে থাকে।তার বেশীর ভাগই হলো ইন্টারনেট/তথ্যপ্রযুক্তির সহজলভ্যতা।

পদস্খলনের এমন কি নেই ইন্টারনেটের মধ্য?।শুধু তাই নয়,যুব সমাজকে দংশ করার জন্য নানা ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মিডিয়া গুলো কাজ করে যাচ্ছে।বিশেষ করে ক্লোজ আপ ওয়ান কাছে আসার গল্প দিয়ে।প্রথম আলোর মত পত্রিকা গুলো পর্যন্ত বাদ নেই।

তাছাড়া মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শিশু বয়স থেকেই গেমসের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠছে।ফ্রি ফায়ার, পাবজির মত গেমসে এতটাই আসক্ত যে,সেইটা বলা বাহুল্য।

বর্তমানে প্রতিটি শহরের এবং গ্রামের প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় ১০ থেকে ২০ বছর বয়সী ছেলেরা দল বেধে বসে বসে গেমস খেলে।প্রতিটি ছেলের সাথেই একটি করে এন্ড্রয়েড ফোন।তাদের আংগুলের মাথায় একটি ছোট্ট কভার থাকে।যেই আংগুল দিয়ে গেমস খেলার সময় ফোন স্কল করে।

আর গেমস খেলতে খেলতে বিরক্ত লাগলে আবার ফেইসবুক পেইজে ঢুকে স্কল করতে থাকে।দিনের পর দিন মাসের পর মাস এইভাবেই চলতে থাকে।এভাবে যখন চলতে থাকে, একটা সময় এসে ফোন ইইজ করা নেশা করার মত এডিক্টেট হয়ে যায়।মাথার ব্রেনের ডোপামিন নি:স্বনের প্যাথওয়ে পরিবর্তন হয়ে যায়।তখন কোন মানুষ ভাল কথা বললেও বিরক্তবোধ করে।মা বাবা প্রয়োজনীয় কোন কাজ করতে বললেও কর্ণপাত করে না।

৪.বন্ধুর প্রভাব: শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করার সাথে সাথে অনেক মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই সময়টাতে বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন শিক্ষক সবার থেকে বন্ধুত্বের কথাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

বেশিরভাগ ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব নির্বাচনে এক বিশাল বড় ভুল করে থাকে।কাকে বন্ধুত্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে বন্ধুত্ব গ্রহন থেকে বিরত থাকতে হবে সেটা আমাদের জানা নেই। আবার অনেকের ক্ষেত্রে জানা থাকলেও মানতে আগ্রহী নয়।

কিন্তু বন্ধুত্বের প্রভাব যে কতটা বিস্তার করতে পারে সেটা বলাই বাহুল্য। আজকাল স্মোকিং বলেন প্রেম বলেন পর্নোগ্রাফি বলেন মাদকাসক্ত বলেন। প্রেম করার পর বাবা মার মুখে চুনকালি মেখে ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা বলেন। এই সবগুলোর পিছনের বন্ধুত্ব জিনিসটা কাজ করে থাকে।

বর্তমান সমাজে বন্ধুত্বটাকে বাবা মায়ের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। একটি বাস্তবতা হল বাবা মা যদি সন্তানের সাথে বন্ধুত্ব ভাবাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। তাহলে সন্তান বাবা মার থেকে বন্ধুত্বকেই বেশি গুরুত্ব দিবে এটাই বর্তমান স্বাভাবিক ব্যাপার।

বন্ধু স্মোকিং করছে আমাকেও করতে হবে। বন্ধু প্রেম করছে আমাকেও প্রেম করতে হবে। বন্ধু পাশ্চাত্যের কালচার ফলো করছে আমাকেও করতে হবে। তা না হলে যে বন্ধুর সামনে নিজের পেস্টিজ থাকেনা।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে ক্লাস ফ্রেন্ড ছাড়াও অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে ওঠে। হয়তো পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ অন্য প্রান্তের মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ঘরে তুলছে। নিজের অজান্তেই পৃথিবীর অন্য প্রান্তের সে মানুষটির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে বুঝতেই পারছে না।

এমন অনেক ছেলে মেয়ে আছে যাদের হয়তো ঐরকম বন্ধু বা বান্ধবী নেই। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া বিচরণ করার কারণে তাদের বন্ধু বান্ধবের অভাব নেই। সেই বন্ধু বা বান্ধবীর ধারা প্রভাবিত হয়ে অনেক কিছুই করে ফেলছে।

তার একটি বাস্তব উদাহরণ হলো কয়েকদিন আগে একটি নিউজ ভাইরাল হয়েছিল।একটি মেয়ে সাথে আরেকটি মেয়ের টিকটক এপ্সের মাধ্যমে ৩ মাসের পরিচয়। তারপর তাদের সাথে ম্যাসেঞ্জারে কথা আদান প্রদান। একদিন হঠাৎ করেই এক মেয়ে আরেক মেয়ের বাড়িতে হাজির।মেয়ে হয়ে আরেক মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে যাবে।বিষয়টি সময় টিভি কভার করেছিল।

ভাবতে পারা যায়,একজন মেয়ে অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে যাবে।আমাদের বাস্তবতা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বন্ধুত্ব নির্বাচনে আল্লাহর রাসূল সা: একটি হাদিস পেশ করছি।বন্ধুত্বের উদাহরণ দিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে আতর বিক্রয়কারী এবং কামারের হাপরের ন্যায়। আতরওয়ালা তোমাকে নিরাশ করবে না। হয় তুমি তার কাছ থেকে (আতর) কিনবে কিংবা তার (আতরওয়ালার) কাছে সুঘ্রাণ পাবে। আর কামারের হাপর, হয় তোমার বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে, নচেৎ তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে আর তা না হলে তার কাছে দুর্গন্ধ পাবে’। (বুখারি)

সব শেষে একজন মানুষের জীবনের সাফল্যে নির্ভর করে। সে সব থেকে বেশী সময় অতিবাহিত করে এমন ৫ জন মানুষের জীবনের সাফল্যের গড়ের উপর।

অতএব আপনি কার সাথে বন্ধুত্ব করছেন,বন্ধুত্ব করার আগে দশবার ভেবে দেখবেন।

<u>৫.প্রেমরোগ:</u> বর্তমান সমাজে তথাকথিত প্রেমরোগ মহামারীতে রুপ নিয়েছে। শুধু তাই নয়,এখন প্রেম করে বিয়ে করা একটা প্রথা হয়ে দাড়িয়েছে।অনেকেই বলে থাকে প্রেম করে বিয়ে করতে না পারলে প্রেমের সার্থকতা কোথায়?

কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা হলোনারী-পুরুষ বিয়েবহির্ভূত প্রেম-ভালোবাসায় জড়াবে না। এই অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,তোমরা জেনা তথা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। (সুরা বনি ইসরাঈল: ৩২)

প্রেমরোগ এমনি একটি রোগ,যা মানুষকে ধুকে ধুকে মারে,বলতে গেলে এটি একটি ক্যান্সার। প্রেম যে কত মানুষের জীবন ধংশ করে ছেড়েছে,কত মানুষের ধর্ম/কর্ম থেকে বিচ্যুত করে দিয়েছে, তার কোন অভাব নেই।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন ২০০৪ সালে একটি গবেষণা চালিয়ে দেখলোহ্যাঁ, যা বলা হয় তা-ই সত্য। প্রেম আসলে অন্ধই। প্রেমে পড়া প্রেমিক/প্রেমিকারা চোখে দেখতে পায় না। (তথ্যসূত্র :আকাশের ওপারে আকাশ বই থেকে)

সমবয়সী /ক্লাসমেটদের সাথেও প্রেমের ঘটনা স্বাভাবিক। তাদের সাথে মা বাবার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা আজকাল ডালভাত হয়ে গেছে।তরুণ /তরুণীদের মাথায় একটি ধারণা চেপে বসেছে।আবার অনেকে ক্ষেত্রে বিশ্বাস হয়ে গেছে,পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলে কিছুদিন পর বাবা মা এমনিতেই মেনে নিবে।আর একটা বাচ্চা হয়ে গেলেতো কোন কথাই নেই।নাতি/নাতনীর মুখ দেখলে আর না মেনে নিয়ে থাকতে পারবেনা।আর বাস্তবতাটাও হচ্ছে এমনিই। যখন একটি পরিবার এই ভাবে মেনে নিচ্ছে,তার দেখাদেখি আরও সবাই সাহাস পাচ্ছে।

আল্লাহর রাসুল সাঃ এর একটি সহীহ হাদীস :

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:"যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করবে তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।"হাদিসটি তিরমিযি (১০২১)।

হাদীস টি থেকে বুঝা যায়,বাবার অবাধ্য হয়ে পালিয়ে গিয়ে মেয়ে বিবাহ করলে সেই বিয়ে শুদ্ধ হয় না।

একটি বার ছেলে এবং মেয়েকে চিন্তা করা উচিৎ,তার বাবা মায়ের কথা।কেমন পরিস্থিতির স্বীকার হয়,যখন ছেলে এবং মেয়ে এই ধরনের অসামাজিক কাজ করে থাকে।সমাজের মানুষের কারো সামনে কথা বলার নূন্যতম মূল্যবোধটুকু হারিয়ে ফেলে।

একটি জানা পরিচিতি একজনের বাস্তব ঘটনা শেয়ার করছি,বাবা ছোট একটি জামে মসজিদের খুতবা দেন।সেই মেয়ের বিয়ের সব প্রস্তুতি শেষ। ছেলে পক্ষও বিয়ের বাজার সহ তাদের আত্বীয় স্বজন দের দাওয়াত দিয়ে ফেলেছে।

এমতাবস্থায় বিয়ের একদিন আগে মেয়েটি তার তথাকথিত ভালবাসার মানুষ কে এবং তার হবু স্বামী কে মোবাইলে কনফারেন্স কলের মাধ্যমে বলতেছে।

আমি এই ছেলেকে ভালবাসি,তাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।এখন আপনি চাইলে আমাকে বিয়ে করতে পারেন।আর আপনি আমাকে বিয়ে করলে জীবনেও সুখী হতে পারবেন না।

একবার চিন্তা করুন তো।তারপর পরদিন মেয়েটির বিয়ে।ছেলে মেয়ের উভয় পক্ষ তাদের আত্বীয়দের দাওয়াত দিয়েছে।দুই পক্ষের বিয়ের বাজার শেষ। এমতাবস্থায় মেয়েটি হবু স্বামীকে ফোন দিয়ে এই কথা বললে।সেই ছেলেটি অবস্থা কেমন হয়েছিল। তার জায়গায় একবার নিজেকে কল্পনা করুন তো।

আর মেয়ের বাবার জায়গায় একবার নিজেকে কল্পনা করুন। তিনি একটি সমাজের মসজিদে খুতবা দিয়ে থাকেন।আপনি এখন তরুণ /তরুণী, আপনি বাবা মা হলে, আপনার আমার সাথে এমন হলে আমাদের কেমন ফিল হবে!!!!প্রশ্নটি আপনার কাছে রয়ে গেল।

একজন মা বাবা তার সন্তান কে কতটা ভালবাসে।নিজের জীবন দিয়ে হলেও সন্তানকে বাচিঁয়ে রাখতে চাই।নিজের জীবনের সব আনন্দ কে তুচ্ছতম মনে করে সন্তানকে তিলে তিলে বড় করে তুলে।কিন্তু সেই বাবা মার থেকেও যিনি আমাকে আপনাকে ভাল বাসেন।তিনি হলেন একমাত্র মহান আল্লাহ তায়্যালা। আর সেই আল্লাহ তায়্যালা তার বান্দাকে যিনা ব্যভিচার করতে পছন্দ করেন না।

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,হে মুহাম্মাদের উম্মতবৃন্দ, আল্লাহর চেয়েবেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন কেউ নেই, তিনি তাঁর কোনো বান্দার ব্যভিচার করা দেখতে পছন্দ করেন না। [সহীহ বুখারী হা:৫২২১)

অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, কিশোর কিশোরীদের আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি, হতাশা, বিষণ্নতা, অবসাদ, অস্থিরতা, আত্মবিশ্বাস-আত্মসম্মান কমে যাওয়া, কাজকর্মের উৎসাহ হারিয়ে ফেলা, ক্রোধ, ভীতি, নিদ্রাহীনতা, ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ড এবং ক্ষুধামন্দার অন্যতম প্রধান কারণ হলো প্রেম এবং ব্রেকআপ।(তথ্যসূত্র :আকাশের উপারে আকাশ বই থেকে)

প্রেমরোগে আক্রান্ত এবং এখনো তথাকথিত প্রেম কে সাপোর্ট করে না,উভয় শ্রেণির ব্যক্তির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বই সাজেস্ট করা হলো :

ইমাম আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ: এর লেখা যাম্মুল হাওয়া যা বাংলা ভাষায় প্রভৃত্তির নিন্দাচার নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

ইমাম আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ: এর লেখা তিব্বুর রুহানী গ্রন্থ যা বাংলা ভাষায় 'মনের উপর লাগাম" প্রকাশিত হয়েছে।

প্রেম সংক্রান্ত বাংলা ভাষায় আরও অনেক বই আছে। উক্ত বই দুটি অধ্যয়ন করলে কুরআন এবং হাদীস থেকে কোমল মতী প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা বিবাহ বহির্ভূত প্রেম যে একটি রোগ।সেইটা স্বীকার করা সহ অনেক কিছু বুঝতে এবং জানতে পারবে।

খুব সুন্দর একটা উক্তি আছেতোমার যখন কোনো ফুল ভালো লাগবে, তুমি তাকে ছিঁড়ে নেবে। যখন তুমি ফুলকে ভালোবাসবে, তখন গাছটাতে প্রতিদিন পানি দেবে।

<u>৬.মাদকাসক্তি:</u> বর্তমান সময়ে খুবই ছোট বয়সেই ধুমপানে আসক্ত হয়ে পড়ছে।কৈশোরে পা দেয়ার আগেই অনেকে একটু একটু ধুমপান শুরু করে।ক্লাস সিক্স সেভেনের ছেলেরা ধুমরাক্কা ধূমপান করে।

ধূমপান বর্তমান সময়ে একটি কমন ইসু। বর্তমান সময়ে ধূমপান কে তেমন কোন কিছুই মনে করা হয় না। কারণ যেখানে গাজার মত নেশা দ্রব্য অ্যাভেইলেবল হয়ে গেছে। সেখানে ধূমপান একটি মামলী বিষয়।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হচ্ছে কেন আজকে ছোট ছোট বাচ্চারা ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়ছে। একটা সময় ছিল যখন তরুণেরা ধূমপান পর্যন্ত লুকিয়ে করতো। কিন্তু এখন গাজার মতো বিষাক্ত নেশা তরুণেরা ওপেন জায়গায় করতেছে।

বিড়ি সিগারেট পান কীভাবে শুরু হয়,মূলত বন্ধুদের দ্বারাই ধুমপান শুরু হয়।প্রথমত বন্ধুরা ধুমপান করছে,কিন্তু নিজে ধুমপান করে না।সাথে থাকতে থাকতে একদিন দুইদিন তিন দিন।তারপর একদিন বন্ধুদের জন্ম দিন সেইদিন আর বন্ধুদের আবদার ফালাতে না পেরে এক টান।প্রথমত খুব বিরক্ত লাগে,বন্ধুরা টিটকারি মারে।

তারপর শুরু হয় আস্তে আস্তে ধুমপান। প্রথমত সিগারেট কিনতে হয় না।বন্ধুরাই কিনে কিনে খাওয়ায়।যতদিন পর্যন্ত নেশা না হয়,যখন নেশা হয়ে যায়।তখন বলে আর কত দিন ফ্রী ফ্রী খাবি।এখন একটু কিনে কিনে খা,,,,,।

সিগারেট দিয়ে তারপর যাবতীয় নেশা দ্রব্যে একটু একটু টেস্ট করা শুরু হয়।কোনটার কোন স্বাদ,বয়স বাড়ার সাথে সাথে নতুন নতুন বন্ধুত্ব হবে।আর নতুন নতুন নেশার সাথে পরিচয় হবে।

বর্তমান সময়ে শুধু ছেলেরাই নয়,মেয়েদের মধ্যে সিগারেট সহ নানাবিধ নেশার আবির্ভাব হয়েছে।যদিও গ্রামে এইরকম টা প্রকাশ্যে তেমন দেখা যায় না।তবে সেই দিন খুব বেশি দূরে নয়।শহরের মেয়েদের মত গ্রামের মেয়েরাও রাস্তা ঘাটে ধুমপান শুরু করে দিবে।

মাদকাসক্তি একটি সমাজ দেশ জাতী ধংশ করা জন্য যথেষ্ট। মাদকাসক্তির কারণে সমাজে নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ করে থাকে।মাদকাসক্তি ব্যক্তি এমন কোন কাজ নেই করতে পারে না। খুন,চুরি, ডাকাতি,মারামারি, কাটাকাটি,ধর্ষণ, একটি কমন ব্যাপার।

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকার বলেন, আমাদের সমাজে ৮০ শতাংশ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটছে মাদকের কারণে। সমাজ পুরোপুরি মাদকমুক্ত করতে পারলেই অপরাধ এমনিতেই কমে যাবে।

নেশা মানুষকে জ্ঞানহীন করে দেয়। তাই পরিমাণ কম হোক আর বেশি হোক মদ ও নেশা ইসলামে যেভাবে গুরুতর অপরাধ, তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবেও অপরাধ। ইসলামের দৃষ্টিতে মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করা হারাম। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা নেশাজাতীয় দ্রব্যসহ অনেক বিষয়ে মুসলিম উম্মাহকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-'হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া কিছু নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।' (সুরা মায়েদা : আয়াত ৯০)

<u>৭. পর্নোগ্রাফিঃ</u> পর্নোগ্রাফি কোন নির্দোষ আনন্দ না। ছোটখাটো কোন বিচ্যুতি না এমন কোন সমস্যা না, না দেখার ভান করে থাকলে তার অস্তিত্ব মিলিয়ে যাবে। ব্যক্তি পরিবার সমাজের জন্য পর্নোগ্রাফি একটি মারাত্মক হুকমি।কারণ এর প্রভাব কেবল সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দীর্ঘ মেয়াদী পর্নোগ্রাফি মানুষকে বদলে দেয়। বদলে দেয় মাথার ভেতরের সার্কিটের গঠন। পর্ন

দেখার সময় মাথায় শুরু হয় ডোপামিন এবং অক্সিটোসিনের মত কেমিক্যাল এর বন্যা।এ কেমিক্যাল গুলো আমাদের সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। প্রতিবার পর্ন দেখার সময় কেমিক্যাল বন্যা সাময়িক অনুভূতি দিয়ে থাকে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল যা তাকে আনন্দ দেই তার দিকে বারবার ফিরে যাওয়া। তাই মানুষ আনন্দের জন্য বারবার পর্নের দিকে ফিরে যায়।এইভাবে একটি লোপ তৈরি হয়। পুনরাবৃত্তির এক পর্যায়ে উচ্চমাত্রার ডোপামিনে অভ্যস্ত মস্তিষ্ক আর আগের মত আনন্দিত হতে পারে না। প্রয়োজন হয় আরো বেশি ডোপামিনের। আরো বেশি আরোও করা পর্নের।তারপর আরো বেশি আরো বেশি। এক সময় প্রায় সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় স্বাভাবিক আনন্দিত হবার ক্ষমতা। (বই:মুক্ত বাতাসের খুজে)।

আমাদের আধুনিক সমাজে পর্নোগ্রাফি শব্দটি একটি ট্যাবু।এই শব্দটি মুখে উচ্চারণ করা যায় না।সবাই শব্দটির অর্থ যথার্থই জানে,কিন্তু মানুষের সামনে উচ্চারণ করতে পাহাড়সম এক বাধায় আটকিয়ে পড়ে।

কিন্তু একটি বিশাল বানিজ্য এই পর্নোগ্রাফি জগৎ থেকে আয় করে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার। পৃথিবীর সব থেকে বড় বানিজ্য পর্নোগ্রাফি থেকে।

বস্তুত আমরা যা মনে করি তা নয়।পর্নোগ্রাফি মারাত্বক একটি ক্ষতিকর ব্যাধি। যুবসমাজ অতপতনের /ধংশের একটা বড় কারণ হলো পর্নোগ্রাফি।

সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী (রহ.) বলেছিলেন,কোনো জাতিকে যদি যুদ্ধ ছাড়া ধ্বংস করে দিতে চাও, তাহলে তাদের ভিতরে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দাও।চোখ বন্ধ করেই বলে দেওয়া যায় আমরা সেই ধ্বংসের দিকেই আগাচ্ছি।

বর্তমান সময়ের সব থেকে সব থেকে বেশী ক্ষতিকারক এবং সহজ কাজটি হচ্ছে পর্নোগ্রাফি। কারণ এর জন্য কোন পরিশ্রম করা লাগে না।অন্যান্য অপরাধ করতে কত কিছু করা লাগে।কিন্তু এই ক্ষতিকারক কাজটি করতে শুধু একটি মোবাইল ফোন হলেই যথেষ্ট। আর কিছুর দরকার নেই,নেই কোন বন্ধু বান্ধবের।পর্ণগ্রাফি কে আমরা তেমন ভয়ানক তেমন কিছুই মনে করি না।মনে করি এইটা আর এমন কি?

কিন্তু এর মাধ্যমে একজন মানুষের আত্বসম্মানবোধ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়।হীনমন্যতা তৈরি হয়,হতাশ হয়ে যায়।জীবনের সব কিছু পানসে হয়ে যায়।কাজ করার মত এনার্জি থাকে না।নিজেকে সব সময় অপরাধী অপরাধী মনে হয়, কিন্তু আমরা বুঝেই ওঠতে পারি না।পর্ণগ্রাফি আমাদের জীবন কে এইভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে।

আমরা তো মনে করছি, আমি একা একা দেখছি,এতে আর কি এত ক্ষতি হচ্ছে,অন্যকে কারো তো ক্ষতি করছি না।বস্তুত পর্ণ ভিডিও একজন মানুষ কে চুড়ন্ত পর্যায়ের নির্লজ্জ করে তোলে।কারণ মানুষের ব্রেনের একটা কমন প্যাটার্ন হলো,মানুষ কোন একটি জিনিস দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হলে।পরবর্তীতে সেইটা বাস্তবে রুপান্তরিত করতে চাই।

আমরা বর্তমানে অশ্লীলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছি।কেউ ইচ্ছুক না থাকলেও কোন না কোন ভাবে আমাদের কে অশ্লীলতার দিকে বার বার টেনে নিয়ে যাচ্ছে।কেউ যদি নিচের দিকেও তাকিয়ে হাটে,তাহলেও পায়ের নিচে একটি কুরুচিপূর্ণ একটি পেপার দেখতে পাবে।বর্তমান সময়ে সব কিছুতেই মেয়ে মানুষ। মেয়েদের একটি পন্য হিসেবে ব্যবহার করছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, বেশীর ভাগ মানুষ মনে করে থাকে।আমিতো পর্নোগ্রাফি দেখে অন্য কারো কোন ক্ষতি করতেছি না।প্রথমত সব থেকে বেশী ক্ষতি করা হচ্ছে নিজেকে।আপনি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত মানে,আপনার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত, আপনার পরবর্তী প্রজন্ম ক্ষতি গ্রস্ত।আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার একটি পর্ণ সাইটে ক্লিকের জন্য কত শত শত হাজার মানুষের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কল্পনা করুণ। গ্রাহক না থাকলে যেমন পন্যের কোন মূল্য থাকে না।ঠিক তেমনি পর্ণগ্রাফি গ্রাহক না থাকলে পর্নোগ্রাফির কোন মূল্য নেই।

আমরাতো অন্য কিছু না বুঝলেও ইন্টারনেট সম্পর্কে খুবই অভিজ্ঞ।একটু ভাবেন তো শত শত হাজার হাজার নারী পাচার হচ্ছে।। এই গুলো কোথায় যাচ্ছে?।

শত শত শিশু পাচার হচ্ছে এই গুলো কোথায় যাচ্ছে?।একটু কষ্ট করে গুগলে সার্চ করে দেখুন, পিলে চমকে যাবেন।আপনার আমার মত মানুষের একটি ক্লিকের জন্য তাদের কে অপহরন করে নিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে।আমি আপনি হয়তো মনে করছি না,আমরা তো কারো ক্ষতি করছি না।জাস্ট রুমে বসে বসে চুপ করে দেখছি।আল্লাহর কসম সেই সমস্ত বোন দের জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে আমাকে আপনাকে দাড়াতে হবে।কারণ আপনার আমার মত মানুষের জন্যই তাদের গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।আর দেদারসে অসহায় বোনদের নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে ভারতসহ অন্যান্য জায়গায় পাচার করে দিচ্ছে।

সব শেষে ভয়ানক এই ক্ষতির বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এবং পর্নোগ্রাফি বিষয়ক বাংলা ভাষায় ৩ টি বইয়ের নামের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

১.মুক্ত বাতাসের খুজে।

২.পর্ণগ্রাফি নিরব ঘাতক।

৩.ঘুড়ে দাড়াও।

বইটি একেক্টি একটি এন্টিবায়োটিকের মত কাজ করবে ইনশাআল্লাহ। শুধু পর্নোগ্রাফি আসক্ত হলেই বা পর্নোগ্রাফি দেখলেই তাদের পড়তে হবে বিষয়টি এমন নয়।অনেক বাবা মা আছে,তারা হয়তো বিশ্বাস করতে চান না যে,তাদের ছেলে এবং মেয়ে পর্নোগ্রাফির মত এত নির্লজ্জ জিনিস দেখতে পারে।

তাদের জন্য এবং পর্নোগ্রাফির ভয়ানক ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মুক্ত বাতাসের খুজে বইটি অন্তত বইটি অনুরোধ থাকলো।বিশেষ করে ছোট্ট ছোট্ট প্রিয় ভাই ও বোনেরা বই ৩টি যেভাবেই হোক সংগ্রহ করে আশা রাখি পড়বে।

পশ্চিমা বিশ্বের অপসংস্কৃতির আগ্রাসন ও তার প্রতিকার :

বিশ্ব জুড়ে নানা অনাচার,বিশৃঙ্খলা এবং অস্থিরতার মূল খুঁজতে গেলে অস্ত্রের ঝঙ্কার বা ধর্মের কথা এগুলোর কোনটাই আসলে মূল নয়।বরং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং প্রধান উপাদান।স্লো অথচ মূল ফ্যাক্ট হিসেবে এই ফ্যাক্টকে সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস এবং চিন্তা চেতনাকে যখন গ্রাস করে ফেলেছে তখন নিজস্ব বিবেক সম্পন্ন চিন্তা চেতনার প্রয়োগের অবকাশ আর কোথাও নেই।ব্রেইন চলছে কম্পিউটারের সফটওয়্যারের মত।কেউ রিফ্রেশ দিয়ে দিচ্ছে,বা ভাইরাস ঢুকিয়ে দিচ্ছে বা রিপ্লেস করে দিচ্ছে এবং মানুষ তা নিয়েই ঘুরছে।অপসংস্কৃতির থাবা যে ভয়ানক ভাবে মানুষকে পরিচালিত করছে এবং সকল অপকর্মের মূলে এই বিষয়গুলি কাজ করছে তা বোঝার এবং যে কোন উপায়ে তাকে প্রতিহত করার মধ্যেই আগামী দিনের জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

সংংস্কৃতি হলো একটি দেশে বা জাতির অভ্যন্তরীণ একটি বিষয়। প্রতিটি দেশ বা জাতির নিজস্ব কিছু সংস্কৃতি আছে।গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করলে মূলত বিশ্বের মানুষ ২টি ভাগে বিভক্ত। এক মুসলিম, দুই অমুসলিম মানে কাফির যারা আল্লাহ কে বিশ্বাস করে না।তাহলে মুসলিম হিসেবে আমাদের কিছু নিজস্ব সংস্কৃতি আছে।যেই গুলো অমুসলিমদের থেকে আলাদা।

তারপর দেশ বা জাতি হিসেবে চিন্তা ভাবনা করলে প্রতিটি দেশের আলাদা আলাদা সংস্কৃতি আছে।

লেখক পবিত্র সরকার সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন দুটি স্তরে বিন্যস্ত করে।

জীবনের অন্তর্গত সকল বিষয়-কর্ম-চর্চা-সাধনা প্রভৃতিই হচ্ছে সংস্কৃতি। সেটা হতে পারে বস্তুগত কিংবা অবস্তুগত। বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে ঁআমাদের খাদ্যদ্রব্য ও তার উপাদান, আমাদের পোশাক-আশাক, আমাদের আবাস ও গৃহস্থালির নানা উপকর।যেগুলো আমরা স্পর্শ করতে পারি।

অপরদিকে যে জিনিসগুলো আমরা স্পর্শ করতে পারিনা কিন্তু দেখতে পারি অথবা অনুভব করতে পারি। যেমন, নাচ, গান,নাটক, সিনেমা এককথায় মিডিয়া।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন জিনিসটি সম্পর্কে একটি সময় আমার নিজেরও খুব বেশি ধারণা ছিলনা। নাটক, সিনেমা,ইন্ডিয়ান মুভি,সিরিয়াল দেখে দেখে ব্রেন, একটা সময় কাজ করত, যে বা যারা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি মেনে চলে।তারা তো সেকেলে,ক্ষ্যাত,দুনিয়ার কিছু সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই।বিশেষ করে যখন মুরুব্বি টাইপের মানুষ জ্ঞান দিতে আসত।এইটা করা যাবে,সেইটা করা যাবে না।

কিন্তু সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে ১ টি বই পড়ার পর সমস্ত চিন্তা ভাবনা, ধ্যান, ধারণা এমন কি পুরো চিন্তার জগৎ পালটে গেছে।

যেই বইটি না পড়লে হয়তো আজঅবদি অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন কে নিজের আদর্শ মনে করে বসে থাকতাম।সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোন লেখার এই অংশটুকু শুধু মাত্র তোমাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা।আমি জানি লেখা বলতে যেই জিনিস বুঝায়।সত্যিকার অর্থে আমার লেখার মধ্যে সেই নূন্যতম মাধুর্য নেই।কিন্তু তোমাদের জন্য অফুরন্ত ভালাবাসা আছে।যেই ভালবাসা থেকে আজ তোমাদের জন্য এই লেখা।

তোমাকে তুমি করেই বলছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোন।তুমি কি জানো,আজ এই অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল কারণ কি?

এর মূল কারণ যদি তুমি বিস্তারিত জানতে চাও।তাহলে আসাদ বিন হাফিজের লেখা ক্রুসেড সিরিজ বইটি পড়ে দেখ।আরও সংক্ষিপ্ত আকারে পড়তে চাইলে গাজী সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর জীবনী অধ্যয়ন কর।তাহলে আজকের এই অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মূল কারণ তুমি পরিস্কার বুঝতে পারবে।

তুমি আজকে যেইটাকে নিজের আদর্শ বলে ধরে নিয়েছ।সেইটা হোক কথা বার্তা, আচার আচরণ, পোষাক, জ্ঞান বিদ্যা,এমন কোন জায়গা নেই।যেখানে পশ্চিমা অপসাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়নি।

গাজী সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে যুদ্ধরত সমস্ত ক্রুসেডারদের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হরমুজ সালাউদ্দিন আইয়ুবীকে সরাসরি একটি কথা বলেছিলেন। আপনার মত সালাউদ্দিন বার বার জন্ম নিবে না।কিন্তু আমরা যেই ভাবে মুসলিমদের উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছি।

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও এইভাবে চালিয়ে যাবে।আর একদিন অবশ্যই সফল হব। গোয়েন্দা প্রধান হরমুজের কথাটি বার বার আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়।চিন্তা করি,আর ভাবি তারা আজকে কতটা সফল।

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোন তোমরা কি জানো।কেন তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু করেছিল?।মূল কারণ হলো মুসলিমদের ঈমানী শক্তি এতটাই শক্তিশালী যে,এই শক্তির সাথে তারা কখনোই পেরে ওঠে নাই।অবশেষে তারা এই পথ বেছে নিয়েছে।

আজকে তুমি যাকে আদর্শ মনে করছ।সত্যিকার অর্থে তারা এই আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য হাজার বছর কিংবা তারও বেশী সময় ধরে কাজ করে আসছে।তারা মুসলিম জাতির মধ্যে বিবেদ বাধানোর কিনা করেছে।তারা তাদের নিজের মেয়েদের কে মুসলিম শাসককে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছে। এবং সেইটাকে তারা পূণ্য মনে করে।

কিন্তু আফসোস আজকে আমরা সেই বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শ ফলো করে নিজেকে গর্বিত মনে করি।আল্লাহ আমাকেও মাফ করুক।

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোন আজকে আমাদের আদর্শ কে?আমাদের বেশী ভাগ আদর্শ মডেল হলো বিজাতীয় কেউ নয়তো নামকা ওয়াস্তে মুসলিম কেউ।তাদের দেখে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করার চেস্টা করি।তারা কিভাবে কি করে সব কিছু পুঙ্খানু ভাবে চলার মধ্য সফলতা মনে করি।

আল্লাহর রাসুল সাঃ এর বলেছেন, যে যাকে আদর্শ বা ফলো করবে।কিয়ামতের দিন তার সাথে তার হাশর হবে।একবার চিন্তা কর তো,কে তোমার আদর্শ?।

তোমার আদর্শ কি সেই ব্যক্তি,যে বা যারা বিয়ের আগেই ৩/৪ টা করে সন্তান জন্ম দেয়।সত্যিকার অর্থে তারা চাই যে,তুমি তাদেরকেই অনুসরণ করে চলো।শুধু তাই নয়,এইটা করার জন্য তারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করছে।

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোন তুমি নিজেকে একটি বার প্রশ্ন করতো কেন এই বিগত গত বছরের মধ্য ইন্টারনেট এত সহজ লব্য হলো কিভাবে। কিভাবে প্রতিটি অজ পাড়া গাড়ে ছড়িয়ে পড়ছে?।তুমি হয়তো জানো না সুপ্রিয় ভাই ও বোন এর পিছনে কি এক রহস্য লুকিয়ে আছে।

আজ তুমি নিজেকে স্মার্ট ফোন হাতে নিয়ে স্মার্ট মনে করতেছ।আসলে কি তুমি জানো তোমার সময় কে কাজে লাগিয়ে মিলিয়ন /ট্রিলিয়ন ডলার আয় করে নিচ্ছে।তারা তোমার ব্রেনকে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে তারপর আজকের ইন্টারনেট কে কাজে লাগাচ্ছে।তারা পশ্চিমা বিশ্বে অবস্থান করেও আমাদের অজপাড়া গায়ে বসে থাকা তোমার ব্রেইন এর নিয়ন্ত্রণ করছে।

তুমি কি কখনো জানতে চেস্টা করেছো।যে বা যারা ইন্টারনেট আবিস্কার /সহজ লভ্য করেছে।তাদের ছেলে মেয়ে গুলো সারা দিনে কত সময় স্মার্ট ফোন হাতে নিয়ে বসে থাকে?।বই পড়তে বলছি না,একটু গুগল মামার কাছে জিজ্ঞেস কর তো!!!!!

সর্বোপরি একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের কে অবশ্যই আল্লাহর দেয়া বিধান এবং তার রাসূলের সুন্নাহ মেনে চলতে হবে।এর মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সফলতা নিহিত রয়েছে। যদি তুমি নিজের অন্তর কে আল্লাহর জন্য ব্যয় না কর,তাহলে তোমার অন্তর কে শয়তান কাজে লাগাবেই।

আজকে অশ্লীলতার দিকে দিন দিন ধাবিত হচ্ছি।আর নানা ধরনের যুক্তি দিয়ে ফ্রেন্ডশিপ, বিভিন্ন উৎসব এবং বর্তমান টিকটকের মত অশ্লীল এপ্সের মাধ্যমে আমাদেরকে জিনার দিকে ধাবিত করতেই আছে।আর সব থেকে বড় আফসোসের বিষয় এই গুলোকে আমরা মজা নিসেবে নিচ্ছি।এইটা যে এক ধরনের বড় গুনাহ সেইটা মনেই করছি না।অথচ যিনা এমন এক মহা পাপ,যেই পাপের ধারে কাছেও মহান আল্লাহ তাআলা যাইতে নিষেধ করেছেন।অন্য কোন গুনাহের ক্ষেত্রে এই সতর্কবানী পেশ করেন নি।

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোন আজকে তুমি তোমার জীবন তুমি যেভাবে চালাবে,সেই ভাবে চলতে এতে কার কি? এই স্লোগান দিয়ে ফেইসবুকে বলে বেড়াচ্ছ।তুমি কি জান এই স্লোগান দেয়ার মাধ্যমে পশ্চিমারা তোমাকে আল্লাহ কে অস্বীকার কারার দারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে।তাওহীদ মানে কি বুঝ?আল্লাহর একাত্ববাদে স্বীকার করা।তুমি দ্বীন ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছ।তার মানে তোমার জীবনের কোন নিজস্ব ইচ্ছা শক্তিই নেই।আল্লাহর দেয়া প্রতিটি বিধান জীবনে মেনে চলতে হবে,এর নামই হলো ইসলাম।

তোমার জীবনের সময়ের এক্টুও কি নূন্যতম মূল্য নেই।তোমার রব তোমাকে এই পৃথিবীতে এমনি এমনি পাঠান নাই।অবশ্যই তোমাকে একটি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। আর তা হলো একমাত্র তার ই ইবাদত করা।তোমাকে মোজ মাস্তি,আনন্দ, উল্লাস করার জন্য পাঠায়নি।দুনিয়া টা একটা পরীক্ষার জায়গা সুপ্রিয় ভাই ও বোন।

তোমার রবের দিকে ফিরে আস,আমার প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোন ।তুমি হেটে আসলে তিনি দৌড়ে আসেন।বান্দা ভুল করে তাওবা করলে তিনি সব থেকে খুশি হন।তুমি তো তোমার জীবনের হাজারো কষ্ট নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছ।কাউকে বলতে না পারার কারণে নানা ধরনের অনৈতিক কাজ করে,নেশার মাধ্যমে প্রশান্তি খুজে ফিরছ।

একবার মাত্র একবার তোমার রবের সামনে সেজদানবত হয়ে বল,আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর।দেখবে নিজেকে কতটা হালকা মনে হচ্ছে।মানসিক ভাবে প্রশান্তি খুজে পাবে।একমাত্র আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ ভাবে আত্বসমর্পন করা মাধ্যমেই মানসিক প্রশান্তি পাওয়া সম্ভব।

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোন তোমার মডেল /আদর্শ হওয়া উচিৎ মুসয়াব ইবনে উমায়ের,খালিদ বিন ওয়ালিদ,সালমান ফরাসি(রা:),মুহাম্মাদ বিন কাসিম,গাজী সালাউদ্দিন আইয়ুবী এবং খাদিজাতুল কুবরা, ফাতেমা,সুমাইয়া (রা),আসিয়া, মরিয়ম(আ:)।

কিন্তু আফসোস আজকে আমরা তাদের মডেল হিসেবে কিভাবে ফলো করব।আমরা তো তাদের সম্পর্কে কিছুই জানি না।আমরা আছি মোজ মাস্তিতে, দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফুর্তি কর এই স্লোগান নিয়ে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোন আমি তোমাকে দোষারোপ করছি না।আমি যেইদিন গাজী সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারলাম।বিষয়টি বলতে লজ্জিত হলে তখন আমার বয়স ৩০ বছর। সেইদিন আমার মনে হয়েছিল,একজন মুসলিমের সন্তান হিসেবে আমার ৩ বছর বয়সে তার নাম জানার কথা ছিল।পরবর্তীতে ক্রুসেড সিরিজ এবং সিক্রেটস অফ জায়োনিজম পড়ে বিষয় গুলো ক্লিয়ার হয়েছিলাম।

আরও একটি চরম বাস্তবতা হলো তুমি কখনোই একাডেমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই বিষয় গুলো পাবে না।তুমি কি দেখনা,বর্তমানে স্কুল,মাদ্রাসার বই গুলোতে কিভাবে ডিম ভাজি আর আলু ভর্তা করা শিখানো হচ্ছে।।তারা কখনোই চাইবে না,তুমি অথেনটিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখ।একটি জাতির শিক্ষা ধংশ করতে পারলে,সেই জাতি পংগু হিসেবে বিবেচিত হয়ে যায়।

অথেনটিক ইতিহাস সংক্রান্ত বিষয় গুলো জানতে হলে আমাদেরকে একাডেমিক পড়াশোনার বাহিরেও পড়তে হবে।তার জন্য দরকার পাবলিক লাইব্রেরি। কিন্তু খুবই আফসোসের বিষয় বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরীর কোন সিস্টেমই নেই।আছে শুধু ধরাবাঁধা কিছু এ প্লাস পাওয়ার সিস্টেম।

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোন হয়তো কথা গুলো তোমার কাছে খুবই তিক্ত মনে হতে পারে।কিন্তু বাস্তবতা এটাই সত্য।তোমাকে আমি জানি না,চিনি না।তারপরও তোমার প্রতি এত ভালবাসা কেন?।তোমার জন্য সময় স্বপ্লতার মধ্যে সুদূর প্রবাসে বসে স্বল্প জ্ঞান থেকে কিছু লেখা কেন?!!!

তোমার কি জানতে ইচ্ছে করে?।তাহলে শুন রাসূল সাঃ বলেছেন, সমস্ত মুসলিম উম্মাহ একটি দেহের ন্যায়।একটি অংগ ব্যাথা পাইলে সারা দেহে ব্যাথা অনুভব করে।ঠিক তেমনই তোমার দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়া আমাদের কষ্ট লাগে।তুমি আমার দ্বীনি ভাই দ্বীনি বোন।তোমাকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসি।

সময়ের সাতকাহন

সময় বহতা নদীর মত। নদীর স্রোত যেমন উজান থেকে ভাটির দিকে বয়ে চলে, তেমনি সময়ের স্রোত অতীত থেকে বর্তমানের ভেতর দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে বয়ে যায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের এই একমুখী স্রোতে আমরা প্রতিনিয়ত ভেসে চলেছি। সময়ের স্রোত এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে।

অনেকে একে বলেন, অ্যারো অব টাইম।

কিন্তু সময়কে গতিকে থামানোর কি কোন উপায় রয়েছে? অথবা সময়ের গতিকে কি কোন ভাবে পরিবর্তন করা যায়? অথবা সময়ের বিপরীতে কি যাওয়া সম্ভব? এসব উদ্ভট প্রশ্নের জবাব খোঁজার আগে, চলুন দেখে নেয়া যাক সময় ব্যাপারটি আসলে কি এবং কি ভাবে মহাবিশ্বে সময়ের সূচনা হয়েছিলো।

বিজ্ঞানীদের মতে, এখন থেকে ১৩ কোটি ৮০ লাখ বছর আগে একটি মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাংয়ের (**ইরম ইধহম**) ফলে আমাদের চেনা মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল। এই মহাবিস্ফোরণের পরপরই মহাবিশ্ব অতি দ্রুত প্রসারিত হওয়া শুরু করে এবং এখনো প্রসারিত হয়েই চলেছে।

এই প্রসারণের ফলে মহাবিশ্বে স্থানের (ংঢ়ধপব) সৃষ্টি হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা এই তিনটি স্থানিক মাত্রা (ংঢ়ধঃরধষ ফরসবহংরড়হ) রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই মহাবিস্ফোরণের ফলে তিনটি স্থানিক মাত্রার পাশাপাশি আরেকটি ভিন্ন মাত্রার সূচনা হয়েছিলো। মহাবিশ্বে কোন বিন্দুকে চিহ্নিত করতে হলে, ত্রিমাত্রিক স্থানের পাশাপাশি এই চতুর্থ মাত্রাটিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই চতুর্থ মাত্রাটিই হলো সময় বা কাল (ঃরসব)। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিগব্যাংয়ের আগে স্থান এবং কালের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সবকিছুই একটি কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির অবস্থায় ছিল। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলে, সিঙ্গুলারিটি।

বিগব্যাংয়ের ফলে এই একক বিন্দু থেকেই একই সাথে স্থান এবং কালের সৃষ্টি হয়েছে।

যদিও দৈনন্দিন জীবনে স্থান এবং কালকে আমরা আলাদা মনে করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্থান এবং কালের যৌথ বুননেই আমাদের চেনা মহাবিশ্বের অবকাঠামো গঠিত হয়েছে। মোদ্দা কথা হলো, মহাবিশ্বে স্থান এবং কাল পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিজ্ঞানীরা এই যৌথ কাঠামোটির নাম দিয়েছেন স্পেস-টাইম। সময় হচ্ছে মহাবিশ্বের একটি অন্যতম মাত্রা, যার প্রভাবে মহাবিশ্ব সর্বদাই পরিবর্তিত হচ্ছে।

এই পরিবর্তনের গতিকেই আমরা সময়ের গতি হিসেবে চিহ্নিত করেছি। আমরা আমাদের হিসেবের সুবিধার জন্য পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির উপর ভিত্তি করে সময়কে বৎসর, মাস, দিন, ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড ইত্যাদি এককে ভাগ করে নিয়েছি। আমাদের দৈনন্দিন হিসেবে সময়ের গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে এক সেকেন্ড!

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, নদীর স্রোতের গতির মত সময়ের গতিরও তারতম্য হতে পারে। আইনস্টাইন বলেছেন, সময়ের গতি ধ্রুব নয়, এটি আপেক্ষিক। সময়ের গতি তার পর্যবেক্ষকের গতির উপর নির্ভর করে। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে দেখিয়েছেন, বস্তুর গতির কারণে সময়ের গতি কমে যায়। কোন বস্তু আলোর গতিতে চলতে শুরু করলে তার জন্য সময়ের গতি একেবারেই থেমে যাবে। পরবর্তীতে আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে বলেছেন, মহাকর্ষ বলের প্রভাবেও সময়ের গতি কমে যায়। সেজন্য পৃথিবী পৃষ্ঠে সময়ের গতি পর্বত শৃঙ্গে সময়ের গতির চেয়ে কিছুটা কম হয়। বিভিন্ন উচ্চতায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের তারতম্যের কারণে সময়ের গতির মাঝে এই পার্থক্যটি দেখা যায়। বস্তুর গতি অথবা মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সময়ের গতির পরিবর্তনকে বলে টাইম ডাইলেশন (ঃরসব ফরষধঃরড়হ) বা সময় প্রসারণ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে টাইম ডাইলেশনের পরিমাণ এতই সামান্য যে আমরা একে ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। আমরা অবশ্য আমাদের চারপাশে আরও অনেক প্রাকৃতিক ঘটনাবলী দেখি বাস্তবে যেগুলো আসলে অন্যরকম। যেমন ধরুন, পৃথিবীর পৃষ্ঠ আমাদের কাছে সমতল মনে হয়, অথচ পৃথিবীর পৃষ্ঠ হলো গোলাকার। পৃথিবীকে গোলাকার দেখতে হলে, আমাদেরকে পৃথিবীর পৃষ্ঠ ছড়িয়ে মহাশূন্যে অনেক দূর উপরে উঠতে হবে।

তারপর ধরুন, প্রতিদিন পূর্ব দিকে সূর্যোদয় এবং পশ্চিমে সূর্যাস্ত দেখে আমাদের কাছে মনে হতে পারে, সূর্য আমাদের পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীই তার নিজের অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পুবে ক্রমাগত ঘুরছে। যার ফলে আমরা দেখছি পূব দিকে সূর্য উঠছে আর পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে। ঠিক তেমনি ভাবে প্রকৃতিতে টাইম ডাইলেশনের ব্যাপারটিও আমরা সাধারণভাবে বুঝে উঠতে পারি না। তার কারণ হলো, সময়ের এই পার্থক্যটি হয় মাত্র কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের ব্যবধানে। মাইক্রোসেকেন্ড হলো সেকেন্ডের মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ। এটি একটি অতি সামান্য পরিমাণ সময়। এই সামান্য সময়টুকু পরিমাপের জন্য এটমিক ক্লকের প্রয়োজন হয়। এটমিক ক্লকের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময়ের গতির অতি সামান্য পার্থক্যটি বিজ্ঞানীরা সহজেই নিরূপণ করতে পারেন।

টাইম ডাইলেশনের ব্যাপারটি উপলব্ধি করতে না পারলেও, এর বাস্তবিক প্রয়োগ দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়শই করছি। ব্যাপারটি একটু খুলেই বলি।

আজকাল গাড়িতে পথ নির্দেশনার জন্য জিপিএস (এচঝ) স্যাটেলাইটের সাহায্য নেয়া হয়। এসব স্যাটেলাইটগুলো পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে মহাশূন্যে অবস্থান করছে। এদের গতি আলোর গতির কাছাকাছি নয়, সেকেন্ডে মাত্র ৩.৯ কিলোমিটার। আলোর গতি

হলো সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। এসব স্যাটেলাইটের গতি আলোর গতির একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। কিন্তু তারপরও এই গতির জন্য টাইম ডাইলেশনের ফলে জিপিএস স্যাটেলাইটের ঘড়িগুলো প্রতিদিন ৭ মাইক্রো সেকেন্ড স্লো হয়ে যায়।

কিন্তু আগেই বলেছি, সময়ের উপর মহাকর্ষ বলেরও প্রভাব রয়েছে। পৃথিবী থেকে অনেক উচ্চতায় থাকার ফলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব জিপিএস স্যাটেলাইটের উপর কিছুটা কম হয়। এর ফলে জিপিএস স্যাটেলাইটের ঘড়িগুলো পৃথিবীর ঘড়িগুলোর চেয়ে প্রতিদিন ৪৫ মাইক্রো সেকেন্ড বেশি গতিতে চলে। গতি এবং মহাকর্ষ এই দুই ধরনের টাইম ডাইলেশনের জন্য সামগ্রিকভাবে জিপিএসের ঘড়িগুলো পৃথিবীর ঘড়ির চেয়ে ৪৫ বিয়োগ ৭, অর্থাৎ ৩৮ মাইক্রো সেকেন্ড বেশি গতিতে চলে। আমাদের দৈনন্দিন সময়ের হিসেবে এটি খুব বেশি কিছু নয়। তবুও এজন্য জিপিএস স্যাটেলাইটের ঘড়িগুলোকে পর্যায়ক্রমে ক্রমাঙ্কন (**পধষরনৎধঃরড়হ**) করা হয়। এটা না করা হলে, জিপিএস স্যাটেলাইটগুলো সঠিকভাবে কাজ করতে পারত না।

এবার টাইম ডাইলেশনের উপর ভিত্তি করে দুইজন জমজ ভাইয়ের গল্প শোনা যাক। মনে করুন, জমজ ভাইয়ের একজন বাস করে সমুদ্র উপকূলে, আরেকজন বাস করে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুট উচ্চতায় একটি পাহাড়ি শহরে। পাঁচ বছর পর তাদের দেখা হলো। তখন দেখা যাবে সমুদ্র উপকূলে বসবাসকারী ভাইটির বয়স পাহাড়ি শহরে বসবাসকারী ভাইটির চেয়ে সামান্য বেড়ে গেছে। তবে তাদের দুজনের বয়সের ব্যবধানটি হবে মাইক্রোসেকেন্ডে। সাদাচোখে একে বোঝার কোনো উপায় নেই।

এবার মনে করুন, দুইজন জমজ ভাইয়ের একজনকে রকেটে করে মহাশূন্যে পাঠানো হলো। আরেক ভাই পৃথিবীতেই অবস্থান করলো। ধরা যাক, মহাশূন্যে রকেটটি আলোর গতির কাছাকাছি (৯৯%) গতিতে পাঁচ বছর চলার পর পৃথিবীতে আবার ফিরে এল। পৃথিবীতে ফিরে আসার পর দেখা যাবে ওই পাঁচ বছরে পৃথিবীতে ছত্রিশ বছরের সমান সময় পার হয়ে গেছে। এর কারণ হলো, আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুসারে প্রচণ্ড গতির কারণে রকেটের ভেতর সময়ের গতি পৃথিবীর সময়ের গতির তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিল। সেজন্য এক ভাইয়ের কাছে রকেটের ভেতর যে সময়কে মনে হয়েছে পাঁচ বছর, অন্য ভাইটির কাছে সে সময় পৃথিবীতে কেটেছে পুরো ছত্রিশ বছর। ভ্রমণ শেষে মহাশূন্যচারী ভাইটি পৃথিবীতে অবস্থানকারী তার জমজ ভাইটির চেয়ে বয়সে একত্রিশ বছর ছোট হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, সে ফিরে আসবে একত্রিশ বছর পরের ভবিষ্যতে।

অনেকের কাছে একে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী মনে হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর চেয়েও বিস্ময়কর। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আলোর গতির কাছাকাছি গতি অর্জন করতে পারলে টাইম ডাইলেশনের ফলে এই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটবে।

সময় আসলে এক ধরনের বিভ্রম (**রষষঁংরড়হ**)। গতি এবং মহাকর্ষের বিবেচনায় একেক দর্শকের কাছে সময়ের গতি একেক রকম মনে হতে পারে। কিন্তু সব দর্শকই মনে করে তার সময়ই ধ্রুব। আসলে সময়ের গতি ধ্রুব নয়। সময়ের গতি আপেক্ষিক।

সময়ের গতি-প্রকৃতি মানুষের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। মহাবিশ্বে সময়ের স্বরূপ উদঘাটন করার জন্য বিজ্ঞানীরা থার্মোডায়নামিকস বা তাপগতিবিদ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, মহাবিশ্বে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই বিশৃঙ্খলার নাম হলো, এনট্রপি। মহাবিশ্বের সূচনায় এনট্রপি ছিল কম এবং ক্রমেই এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এনট্রপি বাড়ার ফলেই অ্যারো অব টাইম ক্রমেই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মহাবিশ্বে কম এনট্রপি মানে হলো অতীত এবং বেশি এনট্রপি মানে হলো ভবিষ্যত। এই দুইয়ের মাঝে আমরা অবস্থান করি, যার নাম আমরা দিয়েছি বর্তমান। কিন্তু সময়ের অনুক্রমে বর্তমানকে ধরে রাখা যায় না, অথবা অতীতে ফেরা যায় না। সময়ের স্রোত এগিয়ে যায় শুধু ভবিষ্যতের দিকে। কারন প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে মহাবিশ্বের এনট্রপি ক্রমেই বাড়ছে।

সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন। তাঁরা একটি ৫০ ন্যানোমিটার প্রস্থের সিলভার নাইট্রাইড মেমব্রেনে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু করে কম্পন সৃষ্টি করে একে একটি এটমিক ক্লকে রূপান্তরিত করেছেন। তারপর তাঁরা দেখেছেন, যতই নিখুঁতভাবে এই এটমিক ক্লকের কম্পন দিয়ে সময়ের পরিমাপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, ততই ঐ সিস্টেমের এনট্রপি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এনট্রপিই সময়ের মূল বিষয় কিনা সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। আরেকদল বিজ্ঞানী

স্থান-কালের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা স্থান-কালকে একটি কোয়ান্টাম ক্ষেত্র (Quantum field) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই কোয়ান্টাম ক্ষেত্রে স্থান এবং কালের ক্ষুদ্রতম একক রয়েছে। স্থানের ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য হলো প্ল্যাঙ্ক লেংথ (১.৬ x ১০-৩৫ মিটার)। এর নিচে স্থানের কোন অস্তিত্ব নেই। তেমনি কাল বা সময়ের ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য হলো প্ল্যাঙ্ক টাইম (১০-৪৩ সেকেন্ড)। এর কমে সময়ের কোন অস্তিত্ব নেই। এই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান-কালগুলো লুপ বা ফাঁসের মত পরস্পরের সাথে জড়িয়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, একে বলা হয় স্পিন নেটওয়ার্ক। তারপর এই নেটওয়ার্কগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে স্পিন ফোম। এই তত্ত্বে এভাবেই স্থান-কালের কোয়ান্টাম ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। এই তত্ত্বের নাম হলো, লুপ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি বা এলকিউজি।

স্থান এবং কালের ক্ষুদ্রতম একক কখনোই প্ল্যাঙ্ক লেংথ অথবা প্ল্যাঙ্ক টাইমকে অতিক্রম করতে পারে না। কারণ এটিই হলো স্থান এবং কালের সর্বনিম্ন সীমা। এর নিচে স্থান এবং কালের কোন অস্তিত্ব নেই। মোদ্দা কথা হলো, এভাবেই লুপ কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটিতে বিজ্ঞানীরা স্থান-কালের মৌলিক গঠনের একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে এর সপক্ষে কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ নেই, এটি এখনো গাণিতিক সমীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আসলে মানুষের কাছে সময়ের মৌলিক চরিত্রটি এখনো স্পষ্ট নয়। অনেকে মনে করেন মহাবিশ্বে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একই সাথে বিরাজমান। তাঁরা মনে করেন, সময়ের বিভিন্নতার মাঝে অন্তর্নিহিত কোন পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা শুধু বর্তমানকেই দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইনের লেখা একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি। আইনস্টাইন তাঁর এক প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠিটি লিখেছিলেন:

'Now he has again preceded me a little in parting from this strange world. This has no importance. For people like us who believe in physics, the separation between past, present and future has only the importance of an admittedly tenacious illusion.'

মহাশূন্য, মহাবিশ্ব ও পৃথিবী:

ঘরবাড়ি ভালো নয় বলে লোকনিন্দা হয়। কিন্তু শূন্যেরও ভেতর কী ঘর বানাবেন, তা নিয়ে সংশয় ছিল লোকশিল্পী হাসান রাজার। সংশয় ছিল বিজ্ঞানীদেরও। তবে শিল্পীর মতো অজুহাত দিয়ে দায় সারেননি বিজ্ঞানীরা।

তাঁরা শূন্যের ভেতরেই ঘরবাড়ি তৈরি করেছেন, তৈরি করেছেন ঘরের মানুষ। সন্দেহ ছিল আইনস্টাইনের, তাই ইপিআর প্যারাডক্সের জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্যারাডক্স ধোপে টেকেনি।

জয় হয়েছে কোয়ান্টামের।

জয় হয়েছে শূন্যতার শক্তির। আর শূন্যের ভেতর যে ঘরবাড়ি তৈরি সম্ভব তার প্রমাণ আমাদের মহাবিশ্বই।

একসময় পৃথিবীকে সমতল মনে করত মানুষ। তখন একটা প্রশ্ন দেখা দেয় মানুষের মনে, সমতল পৃথিবী কীভাবে শূন্যে ভেসে আছে?

সব কালেই সৃজনশীল ছিল মানুষ।

কেউ যুক্তি দিয়ে, কেউ স্রেফ কল্পনার ফানুস উড়িয়ে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। সাধারণ মানুষ ব্যাখ্যা চায়, তা সে ব্যাখ্যার ভিত যত ঠুনকোই হোক সামান্য একটু যুক্তি থাকলেই যথেষ্ট। তাদের ধারণা পৃথিবী সমতল, মহাকর্ষ বলের ধারণাও প্রাচীনকালের মানুষের ছিল না। তাই পৃথিবীকে শূন্যে ভেসে থাকার জন্য অবলম্বন দরকার। সুতরাং মানুষ কল্পনা করল দানবীয় সব জন্তু-জানোয়ারের।

সেসব জানোয়ারের পিঠে কিংবা কাঁধে সওয়ার হয়ে বসে আছে পৃথিবী!

কিন্তু সেই জানোয়ার কোথায়, কিসের ওপর ভর দিয়ে আছে?

এ নিয়ে একটা মজার ঘটনার কথা লিখেছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম বইয়ের শুরুতেই। সেই বইয়ে তিনি এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর উদাহরণ টেনেছেন। সম্ভবত বিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী বার্ট্রান্ড রাসেল। তিনি একদিন এক সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সেই বক্তৃতায় বিজ্ঞানী মশাই পৃথিবীর আকার, মহাবিশ্বের প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে কথা বললেন। বক্তৃতায় যখন শেষ হলো, তখন এক বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে বলললেন, এতক্ষণ আপনি যা বললেন, সব ভুয়া। বিজ্ঞানী তখন বৃদ্ধার মত কী, সেটা শুনতে চাইলেন। বৃদ্ধা বললেন, পৃথিবী আসলে থালার মতো চ্যাপ্টা।

তখন বিজ্ঞানী জানতে চাইলেন, তাহলে পৃথিবী শূন্যে ভেসে আছে কীভাবে?

জবাবে বৃদ্ধা বললেন, পৃথিবী শূন্যে ভেসে নেই। সেটা দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট কচ্ছপের পিঠের ওপর।

তখন বিজ্ঞানী জানতে চাইলেন, সেই কচ্ছপ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধা বললনে, সেটা দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা পিঠের ওপর। সেই কচ্ছপটা আরেকটা কচ্ছপের পিঠে। নিচের কচ্ছপটার নিচে আরেকটা, তার নিচে আরেকটা...এভাবে অসংখ্য কচ্ছপের পিঠে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের এই পৃথিবী।

শুধু ওই বৃদ্ধা নয়, প্রাচীনকালে সব মানুষই বিশ্বাস করত পৃথিবী কিছুর না কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে। যে প্রাণীর ওপর দাঁড়িয়ে, সেটা আবার আরেকটা প্রাণীর ওপর দাঁড়িয়ে। পৃথিবীকে যদি এমন কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাহলে অসীম সংখ্যক প্রাণী লাগে। কিন্তু অসীম আমরা বলি ঠিকই, কিন্তু সে তো বাস্তব নয়। কোনো কিছু যদি হিসাবের গ-িতে বস্তুগত চেহারায় আনতে হয়, তাহলে অসীমের হিসাব সেখানে চলে না।
তাই একটার নিচে আরেকটা কচ্ছপ দাঁড়িয়েও যদি থাকে তাহলে একসময় নিশ্চয়ই কচ্ছপ শেষ হয়ে যাবে। শেষ কচ্ছপটি তাহলে কিসের ওপর দাঁড়িয়ে? এ প্রশ্নের জবাব সেকালের কল্পনাবিলাসী পণ্ডিতদের কাছে ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানী জোহান কেপলার আর আইজ্যাক নিউটনের প্রতিষ্ঠিত করা মহাকর্ষ সূত্র সেই সমস্যার সমাধান করে দেয়। কচ্ছপের পিঠ থেকে তাঁরা পৃথিবীকে নামিয়ে আনেন মহাশূন্যে। অবশ্য প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছিলেন পৃথিবী গোলাকার। আর গোলাকার পৃথিবী ভেসে আছে মহাশূন্যে। কিন্তু তিনি একটা বড় ভুলও করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র, এর চারপাশে ঘুরছে মহাবিশ্বের সকল বস্তু!
পরে মধ্যযুগে এসে সে সমস্যার সমাধান হয়। এই আধুনিক যুগে এসেও কিন্তু কচ্ছপের সমস্যায় আবার নিমজ্জিত হয়েছে পদার্থবিজ্ঞান। সেই সমস্যাটা হলো বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণকে ঘিরে। একটা প্রশ্ন প্রায় সব বিজ্ঞানপ্রেমীর মধ্যে, মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়েই যদি মহাবিশ্বের জন্ম হয় তাহলে তার আগে কী ছিল?

সমস্যার শুরু বিংশ শতাব্দীর বিশের দশক। আইনস্টাইনের কয়েক বছর আগে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা প্রকাশ করেছেন। সেই তত্ত্বের সমাধান করেই রুশ বিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান আর মার্কিন বিজ্ঞানী এডউইন হাবল দেখালেন মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু আইনস্টাইন সেটা মানতে নারাজ। কারণ, নিউটনের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্ব স্থির এবং সসীম। সে সময় ফ্রিডম্যান মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ কীভাবে ঘটছে, তার একটা মডেল বা প্রতিরূপ দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মহাবিশ্ব সব সময় সম্প্রসারিত হচ্ছে, এর ফলে প্রতিটা গ্যালাক্সি আরেকটা গ্যালাক্সি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফ্রিডম্যান আরও বলেছিলেন যেসব গ্যালাক্সি যত দূরে তার দূরে সরে যাওয়ার গতিও তত বেশি। কিন্তু বাদ সাধলেন আইনস্টাইন। তাঁর সমীকরণ থেকেই যেহেতু মহাবিশ্বের প্রসারণের বিষয়টা আসছে তখন তিনিই সেটা থামাতে পারবেন বলে ভাবলেন। এ জন্য সাধারণ আপেক্ষিকতার সমীকরণে আইনস্টাইন একটা বাড়তি ধ্রুবক যোগ করলেন। সেই ধ্রুবকটা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে মহাজাগতিক ধ্রুবক নামে পরিচিত। কিন্তু ওই দশকের শেষ দিকেই মহাবিশ্বের প্রসারণ সত্যি সত্যি ঘটছে- এই প্রমাণটা এত অকাট্য যে আইনস্টাইনও সেটা মানতে বাধ্য হলেন। তখন মহাজাগতিক ধ্রুবকের জন্ম দেওয়াটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বলে স্বীকার করে সেটা সমীকরণ থেকে ছেঁটে ফেললেন। কিন্তু সেই ধ্রুবকই বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আবার ফিরে আসে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র নিয়ে। আইনস্টাইন সেটাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন মহাবিশ্বের প্রসারণ বন্ধ করতে, এখন সেটাই ব্যবহার করা হচ্ছে মহাবিশ্বের ত্বরিত প্রসারণ ব্যাখ্যা করতে।

হাবল যখন নিশ্চিত হলেন মহাবিশ্ব সত্যি সত্যিই প্রসারিত হচ্ছে, তখন একটা নতুন ভাবনা কাজ করল বিজ্ঞানীদের মাথায়। সেটা হলো, মহাবিশ্বের সব বস্তুই যদি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে নিশ্চয়ই একসময় একসঙ্গে ছিল। অনেকটা বোমা ফাটার মতো ব্যাপার। বোমাটার পর এর ভেতরের পদার্থ যেগুলোকে আমরা স্প্লিন্টার বলি, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে মহাবিশ্বেও কি এমন কোনো ঘটনা ছিল? মহাবিশ্ব কি আগে একটাই বিন্দু ছিল, সেই বিন্দুতেই ঘটে বিস্ফোরণ আর সেই বিস্ফোরণের পরেই জন্ম হয় বস্তুকণার, সময়ের বিবর্তনে সেসব বস্তু গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সি ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছে?

ব্যাঙ থেকে ব্যাটারি:

ইতিহাসের প্রথম সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল বাঙের নাচন থেকে। সায়েন্স ফিকশনটার নাম ফ্রাঙ্কেনস্টাইন অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস। লেখক ব্রিটিশ কবি পিবি শেলির স্ত্রী মেরি শেলী। উপন্যাসটা প্রকাশের পর বিশ্বজুড়ে ঝড় ওঠে।

বিশ্ব বুঝতে পারে সাহিত্যের এক নতুন ধারা তৈরি হয়েছে মেরি শেলির হাতে। এই উপন্যাসে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী নতুন এক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি আবিষ্কার করেন। এর সাহায্যে মৃতদেহের শরীরে প্রাণ ফিরে আসে।

ফ্রাঙ্কেস্টাইন এক মৃতদেহের শরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিরেন।

কিন্তু সেটা স্বাভাবিক মানুষের মতো হয়নি। কুৎসিত এক দানবের চেহারা পেয়েছিল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সেই দানবকে দেখে ভয় পেয়ে যান। দুর-দুর করে দানবটাকে তাড়িয়ে দেন নিজের কাছ থেকে।

অন্যদিকে দানবের মতো চেহারা হলেও প্রাণ ফিরে পাওয়া মৃতদেহের মনটা ছিল স্বাভাবিক মানুষের মতই নরম। ভালোবাসার কাঙাল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাছে স্নেহ-ভালোবাসা ভিক্ষা চেয়েছিল। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মন গলেনি। তাকে শুধু দূরেই ঠেলে দিয়েছিলেন।

তারপর যেদিকেই গিয়েছে দানবটা, চারদিকে শুধু ঘৃণা দেখেছে।

ভালোবাসার কাঙাল দানবটা তখন সত্যিকারের দানব হয়ে ওঠে। মেতে ওঠে ধ্বংসের খেলায়। শেষমেষ নিজের সৃষ্টিকর্তা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে হত্যা করে নেয় চরম প্রতিশোধ।

কালের প্রক্রিময়া শেলির সেই উপন্যাস সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু ব্যাতিক্রমি এই কাহিনীর আইডিয়া তিনি কোথায় পেয়েছিলেন?
পেয়েছিলেন ইতালিয়ান বিজ্ঞানী লুইজি গ্যালভনির এক বিখ্যাত ও হাস্যকার পরীক্ষা থেকে। গ্যালভনি পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। আর চিকিৎসকদের কত জন্তুজানোয়ার কাটাকুটি করে গবেষণা করতে হয়। গ্যালভনিও করেতন। বিশেষ করে ব্যাঙ কাটতেন তিনি।

১৭৭৮ সাল। গ্যালভনি একদিন একটা ব্যাঙ কেটে রেখে দিয়েছিলেন টেবিলের ওপর। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন অন্যকাজে। গ্যালভনির এক সহকারী একটা ধাতব ছুরি দিয়ে ব্যাঙটাকে কেন জানি স্পর্শ করেন। আর তাতেই নড়ে ওঠে মরা ব্যাঙের একটা পা। সহকারী ভয় পেয়ে যান। বলেন গ্যালভনিকে। তিনিও ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখেন। ফল একই। প্রথমে গ্যালভনিও ভয় পেয়ে যান। ভাবেন যেকোনোভাবে হয়তো মরা ব্যাঙের শরীরে প্রাণ ফিরে এসেছে!

কীভাবে প্রাণ ফিরে এলো?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে গ্যালভনি করলেন প্রচুর গবেষণা। এক সময় নিশ্চিত হলেন, ব্যাঙের শরীরে আসলে প্রাণ ফিরে আসেনি। ততোদিনে যা রটার রটে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে একটা আর্টিকেল লিখে ছাপিয়েছিলেন গ্যালভনি। তাতেই সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। এ নিয়ে জন্ম হয় নানারকম হাস্যকৌতুকের। আসলে মৃত ব্যাঙের শরীরে প্রাণ ফেরানো সম্ভব নয়। ব্যাপারটা সবাই বুঝেছিলেন। তাই মজা করে গ্যালভনির নাম দিয়েছিলেন ব্যাঙ নাচানো বিজ্ঞানী।

এই ঘটনা থেকে অনুপ্রাণীত হয়েই মেরি শেলী লেখেন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। কিন্তু এর সঙ্গে ব্যাটারির কি সম্পর্ক?

গ্যালভনি দ্রুতই বঝতে পারেন, ব্যাঙের নড়ে ওঠার কারণ বিদ্যুৎ। তিনি শুধু ছুরি নয়, তামার তারসহ নানা রকম ধাতব জিনিস দিয়ে মরাব্যাঙের শরীর স্পর্শ করালেন। একই ফল পেলেন।

এই বিদ্যুৎ কোত্থেকে এলো?

সেকালের বিজ্ঞানীরা আজকালকার মতো কারেন্ট বা চল বিদ্যুতের কথা জানতেন না। তবে স্থির বিদ্যুৎতের কথা জানতেন। যেমন মাথার চুলে চিরুনি ঘষলে স্থির বিদ্যুতের জন্ম হয়। তখন সেই চিরুনি কাগজের ছোট ছোট টকুরোকে আকর্ষণ করতে পারে।

গ্যালভনির বাড়িতে স্থির বিদ্যুৎ তৈরির একটা যন্ত্র ছিল। প্রথম দিকে তাই তিনি ভেবেছিলেন, ওই যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ এসে হয়তো মরাব্যাঙের দেহ নাচিয়ে দিচ্ছে। পরে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত হন, এ ধারণা ভুল। বাগানে একটা লোহার শিক ছিল। সেই শিকেও ব্যাঙ ঝুলিয়েছিলেন গ্যালভনি। তখননো দেখলেন, ঝুলন্ত ব্যাঙের দেহটাও নড়ে উঠল।

এখানে বিদ্যুৎ কোত্থেকে এলো?

গ্যালভনি হিসাব করে দেখলেন আকাশে বিদ্যুৎ চমকালেও তার থেকে কিছু বিদ্যুৎ নেমে আসে পৃথিবীতে। বিদ্যুৎ না চমকালেও বাতাসের ভেতরেই হয়তো স্থির বিদ্যুৎ লুকিয়ে আছে। তখন নিশ্চিত হওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু এখন আমরা জানি, সৌরঝড়ের কারণে তৈরি হওয়া আয়ন বায়ুর প্রভবে বাতাসে যথেষ্ট পরিমাণ স্থির বিদ্যুৎ তৈরি হয়। এছাড়া দূর মহাকাশ থেকে আসা মহাজাগতিক রশ্মিতেও যথেষ্ট পরিমাণ আয়নিত কণা থাকে। প্রতিটা আয়ন কণা আসলে একেকটা বিদ্যুতের আধার।

বাতাসের প্রভাবেই ধাতব বস্তুতে বিদ্যুৎ জমা হতে পারে। এমনটাই ভেবেছিলেন গ্যালভনি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, দুটো আলাদা ধাতু দিয়ে ব্যাঙের দেহ এক সঙ্গে স্পর্শ করলে ব্যাঙটা বেশ ভালোভাবে নড়ে ওটে। তবে তিনি শুধু স্থির বিদ্যুতের কথাই ভাবেননি।

তিনি আরেক ধরনের বিদ্যুতের কথাও ভেবেছিলেন। সেটা হলো জৈব বিদ্যুৎ। তিনি অনুমান করেছিলেন দুটো ধাতব তার স্পর্শ করলে ব্যাঙের শরীরর থেকে জৈববিদ্যুৎ মুক্ত হয়। তারই ফলে ব্যাঙের দেহ নড়ে ওঠে।

আসলে নিজের অজান্তেই গ্যালভনি প্রথমবারের মতো ব্যাটারি আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। কীভোবে সে ব্যাখ্যায় পরে আসি। ব্যাঙ নাচানোর ব্যাপারটাতে বিদ্যুতের কারসাজি পুরোপুরি বুঝতে পারেননি গ্যালভনি। কিন্তু তার সমসাময়িক আরেক ইতালিয়ান বিজ্ঞানী ঠিকই বুঝলেন। তার নাম আলসান্দ্রো ভোল্টা। তিনি প্রথমে জৈববিদ্যুতের ব্যাপারটা মেনেই কাজ করছিলেন। কিন্তু আর গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখেন ব্যাঙ বা কোনো প্রাণীর দেহ এখানে মুখ্য নয়। বিদ্যুৎ তৈরির জন্য দরকার একটা ভেজা মাধ্যম। ব্যাঙের বদলে যেকোনো ভেজা জিনিস ব্যবহার করে তার দু মাথায় দুটো ধাতব জিনিস লাগিয়ে দিলেই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়।

তিনি নানা কিছু দিয়ে পরীক্ষা করলেন। এরপর তিনি লবণ কিংবা ক্ষার মেশানো ভেজা জিনিস দিয়ে পরীক্ষা করেও একই ফল পেলেন।
ভোল্টা তার এই সিস্টেমের গুরত্ব বুঝেছিলেন। তাে্ই তিনি জিনিসটা আরও উন্নত করার চেষ্টা করলেন। ব্যাঙের বদলে তিনি ব্যবহার করলেন একটা কাগজের চাকতি। সেটা ভেজালেন লবণ মেশানো পানি দিয়ে।

চাকতির একপাশে একটা তামার পাত আরেক পাশে একটা দস্তার পাত জুড়ে একটা যন্ত্র তৈরি করলেন। শুধু একটা নয়। বিশ-ত্রিশটা যন্ত্র তৈরি করলেন। তারপর একটার দস্তার পাত আরেকটা তামার পাতের সঙ্গে একই ক্রমে সবগুলে জুড়ে দিলেন। বিদ্যুৎপরিবাহী তার দিয়ে। সবগুলো যখন জোড়া শেষ তখন পুরো সিস্টেমটার একদিকে একটা মুক্ত তামার পাত থাকল, অন্যদিকে একটা মুক্ত দস্তার পাত থাকল। সবটা মিলে তৈরি হলো একটা ব্যাটারি। ভোল্টা মুক্ত তামার আর দস্তার পাত দুটোকে একটা তার দিয়ে জুড়ে দিয়ে দেখলেন, আগুনের স্ফূলিঙ্গ দেখা যায়।
ভোল্টা বুঝলেন, তামার ও দস্তার মুক্ত পাত দুটো সরাসরি যুক্ত না করে এদের মাঝখানে যদি কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র রাখা যায়, তাহলে সেটা বেশ কাজ করবে। ব্যাস এভাবেই তৈরি হলো পৃথিবীর প্রথম ব্যাটারি।

এরপর সময়ের সঙ্গে এই ব্যাস্থার আরও উন্নতি ঘটলেন বিজ্ঞানীরা। এখনো চার্জার ফ্যান, মোটরগাড়ি বা এই ধরনের বড় বড় জিনিসগুলোতে যেসব বড় বড় ব্যাটারি দেখা যায়, সেগুলোর মূল কৌশল ওই গ্যালভনির আর ভোল্টার থেকে পাওয়া। অর্থাৎ আজ যে আমরা বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখার জন্য যতরকম ব্যাটারি দেখি, সেগুলোর আদী সংস্করণ হলো একটা মৃত ব্যাঙ।

স্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের বিস্ময়কর কাহিনি:

চিকিৎসকের প্রতীক কী? সাদা অ্যাপ্রোনেরে স্টেথোস্কোপ। বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিকিৎক থেকে হাতুড়ে ডক্তার, সবার হাতেই এই জিনিসটা থাকে। এই স্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের কাহিনিটা বেশ মজার। তবে বলে রাখি, সত্যিকারের স্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের আগেও অনেকে অনেক ভাবে স্টোথোস্কোপের প্রয়োজন মেটাতেন।

স্টেথোস্কোপ সবচেয়ে বেশি দরকার হয় শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্য। তাছাড়া রক্তচাপ মাপার কাজেও স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করা হয়।

স্টেথোস্কোপ আবিষ্কার হয় ১৮১৬ সালে। তার আগে নানাভাবে স্টেথোস্কোপের কাজ চালিয়ে নিতে হত।

খ্রিষ্টের জন্মেরও আগে, গ্রিক যুগে চিকিৎসকেরা রোগীর বুকে কান লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের অবস্থা ও হৃৎকম্পন বোঝার চেষ্টা করতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে এ ব্যবস্থাটাকে আরেকটু এগিয়ে নেন অস্ট্রিয়ান চিকিৎসক লিওপোল্ড ওয়েনব্রুগার। তিনি রোগীর শরীরের বিভিন্ন স্থানে টোকা মেরে, সেখানে কান লাগিয়ে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বোঝার চেষ্ট করতেন। লিওপোল্ডের একটা থিওরি ছিল।

খালি পাত্রে টোকা দিলে একরকম শব্দ হয়। সেই পাত্রের অর্ধেকটা পানি ভর্তি করলে শব্দের ধরন বদলে যায়। সম্পূর্ণ ভর্তি করলে শব্দ একদম আলাদা রকমের হয়। এই ব্যাপারটাই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন চিকিৎসাক্ষেত্রে।

খালি পেটে থাকা কোনো রোগি আর ভরা পেটে থাকা রোগীর শরীরে টোকা দিলে আলাদা রকম শব্দ হবে।

তেমনি পেটে গ্যাস হলে, কিংবা তরলে ভর্তি থাকলে শব্দের মাত্রা যাবে বদলে। তখন ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের শব্দ কিছুটা বদলে যাবে। এই ব্যাপারগুলো খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন লিওপোল্ড। কিন্তু এরজন্য যে কোনো যন্ত্র তৈরি করতে হবে, তেমন ভাবনা আসেনি তাঁর মাথায়।

১৮১৬ সাল। ফরাসী চিকিৎসক রেনে লেইনেক ব্যস্ত প্যারিসের নেকার হাসপাতালে। রেনে যক্ষার চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। যক্ষা তখন মারণব্যাধি। তাই এই রোগের চিকিৎসা বেশিরভাগ চিকিৎসক করতে চাইতেন না। রেনে এ ব্যাপারে খুব উদার ছিলেন।

একদিন বিশাল শরীরের এক রোগি এলো তার কাছে। যক্ষায় আক্রান্ত। রোগী যেমন যেমন মোটাসোটা, গায়ে তেমনি দুর্গন্ধ। ফরসীরা আসলে গোসলের ব্যাপারে আলসে। কয়েক সপ্তাহ পর পর তারা গোসল করে। তাই গায়ে বদগন্ধ তৈরি হয়। আর সেই গন্ধ ঢাকার জন্য তাঁরা নানা রকম সুগন্ধি ব্যবহার করে। এ কারণেই কিন্তু পারফিউম বা সুগন্ধি উৎপাদনে ফরসীরা বিখ্যাত।

যাইহোক, একে দুর্গন্ধ, তার ওপর বিশাল শরীর। বুকে কান লাগিয়ে ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের গতিপ্রকৃতি বোঝা কঠিন হলো। তাছাড়া যক্ষা রোগীর মুখের খুব কাছে গিয়ে কান পাতাও ঝুঁকির। চিকিৎসক নিজেও আক্রান্ত হতে পারেন। তখনই আসলে রেনে একটা যন্ত্রের অভাব বোধ করলেন। যন্ত্র তো পরের কথা, এখন এই রোগী শামলাবেন কী করবেন! দুশ্চিন্তায় পায়চারী শুরু করলেন রেনে। আনমনে গিয়ে বসলেন হাসাপাতালের বাগানের বেঞ্চে।

তখনই একটা ব্যাপার চোখ খুলে দিল রেনের। দুজন বালক খেলছে বাগানে। ওদের হাতে একটা একটা লম্বা কাঠ আর পিন। একজন কাঠের এক মাথায় পিন দিয়ে আঁচড় কাটছে। অন্য জন কাঠের অন্যপ্রান্তে কান লাগিয়ে শুনছে।

এ ধরনের খেলা ছেলেমেয়েদের সচারাচর খেলতে দেখা যায়। কিন্তু সেদিনে এই খেলাটাই রেনে মাথায় একটা আইডিয়া জন্ম দিয়েছিল। ওই ছেলেদুটোর খেলা দেখে রেনের মনে পড়ে যায় শব্দবিজ্ঞানের কথা। তিনি জানতেন, বাতাসের তুলনায় পানিতে শব্দের বেগ প্রায় সাড়ে চার গুণ। অন্যদিকে পানির তুলনায় কাঠের ভেতরে শব্দের বেগ আরও বেশি, প্রায় ১২ গুণ।

সেটা ছিল রেনের জন্য ইউরেকা মোমেন্ট। তিনি দ্রুত রোগির কাছে ফিরে এলেন। তাঁর টেবিলে ছিল একটা মেডিকেল জার্নাল। সেটা রোল করে কানে লাগালেন একটা মাথা আরেক মাথা রাখলেন রোগির বুকে। এখন দিব্যি রোগির হৃৎকম্পন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি শোনা যাচ্ছে।
তারপর রেনে সত্যিকারের একটি স্টেথোস্কোপ বানালেন। সেটা কাঠ দিয়েই। গোলাকার লম্বা একটা কাঠের ভেতর ছিদ্র করে নলের মতো বানালেন। সেটাই ছিল ইতিহাসের প্রথম স্টেথোস্কোপ। এরপর আরও তিন বছর খেটেখুটে তিনি স্টোথোস্কোপের উন্নতি ঘটান।

লুই পাস্তুর ও কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা:

১৮৬০-এর দশক। তখন জীবাণুবিজ্ঞানে ফরাসী বিজ্ঞানী পাস্তুর একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছেন। তিনি পাস্তুরায়ন পাদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, যা ওয়াইন আর দুধসহ নানা ধরনের তরল খাবারকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারত।

জীবাণুবিজ্ঞানে লুই পাস্তুরের তখন নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঠিক সেই সময়, ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে মড়ক লাগে। কলেরার মড়ক। তবে মানুষের নয়, মুরগরির খামাগুলোতে। কাতারে কাতারে মুরগি মারা পড়ছে কলেরায়।

খামারিদের কেউ কেউ ভাবলেন, নিশ্চয়েই কলেরার পেছনে কাজ করছে কোনো জীবাণু। তাই তাঁরা দারস্থ হলেন লুই পাস্তুরের।

পাস্তুর তাঁদের ফিরিয়ে দেননি। শুরু করে দেন কাজ।

পাস্তুর ভাবলেন, কলেরার মড়ক থামাতে হলে প্রথমেই চিহ্নিত করতে জীবাণুকে। শুধু তাই নয়, কখন কী অবস্থায় জীবাণুরা মুরগিদের আক্রমণ করে সেটা জানা জরুরি। আক্রান্ত মুরগির দেহ থেকে জীবাণু সংগ্রহ করলেন পাস্তুর। সেসব মুরগির কোনটা ছিল বেশি আক্রান্ত, কোনটা কম আক্রান্ত, কোনোটার অবস্থা কাহিল। এদের জীবণুগুলোর মধ্যেও নিশ্চয় তারতম্য আছে।

কিন্তু সে সময় পরীক্ষাটা বেশিদূর এগোলো না।

গবেষণা শেষ করার আগেই পাস্তুর ছুটিতে গিয়েছিলেন। প্রায় এক মাসের ছুটি। এ সময় মুরগির দেহ থেকে সংগ্রহ করা জীবাণুভর্তি তরল একটা পাত্রে রেখে গিয়েছিলেন। ছুটি শেষে দেখেন পচন ধরেছে সেই তরলে। কলেরার জীবাণু নিশ্চয়ই তরলে পচন ধরায়নি!

পচন ধরানো এদের কাজ নয়। নিশ্চয়ই অন্যকোনো ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তরল পদার্থ। পাস্তুরের অনুমানই ঠিক ছিল। অন্য জীবাণুর আক্রমণে তরলে পচন ধরেছে। এমনকী কলেরার জীবাণুকেও দুর্বল করে দিয়েছে সেইসব ব্যাকটেরিয়া।

সেই দুর্বল জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা চালালেন পাস্তুর। সেগুলো পুশ করলেন সুস্থ মুরগির শরীরে। দুর্বল জীবাণু মুরগিদের কলেরায় আক্রান্ত করলে ঠিকই, কিন্ত বড় কোনো ক্ষতিই করতে পারল না। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল মুরগিগুলো। এবার সেই মুরগির শরীরে তরতাজা কলেরার জীবাণু প্রয়োগ কলেন। কিন্তু এবার মুরগির কিছুই পারল না।

পাস্তুর বুঝলেন, দুর্বল জীবাণু শরীরে প্রবেশের পর রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা সেগুলো চিনে রাখে। পরে যখন পূর্ণশক্তির জীবাণু প্রবেশ করানো হয়, তখন চেনা শত্রুর বিরুদ্ধে সহজেই লড়াই করে জিতে যায় মুরগির শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা।

পাস্তুর বুঝে গেলেন দুর্বল জীবাণুগুলোই হতে চলেছে তাঁর তুরুপের তাস।

জীবাণু দুর্বল করে সেগুলো দিয়েই তৈরি করে ফেললেন কলেরার টীকা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা যাকে বলে। ফ্রান্সের মুরগির খামারিরা বেঁচে গেল কলেরার মড়ক থেকে।

পৃথিবীর প্রথম টিকা জেনার আবিষ্কার করেছিলেন ঠিকই। পাস্তুরের কৃতিত্ব অন্য জায়গায়। জেনার গুটিবসন্তের টিকা তৈরি করেছিলেন গোবসন্তের জীবাণু দিয়ে। কিন্তু পাস্তুর মুরগির কলেরার টিকা বানালেন কলেরারই দুর্বল জীবাণু দিয়ে। সত্যিকারের কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা বুঝি একেই বলে!

কারিগরি / বৃত্তিমূলক শিক্ষা

মানব জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম । শিক্ষা জীবন শেষে কর্মজীবনে প্রবেশকালেই বুঝা যায় সিলেবাস আমাদের কী শিখায় ?

সিলেবাস আমাদের শুধু সার্টিফিকেটের মালিক বানায় ,বাস্তব জীবনে তা কতটা কাজে লাগে তা ভেবে দেখার সময় এসেছে ।

এক বাস্তব ঘটনা শেয়ার করবু রাসেল দরিদ্র পরিবারের সন্তান ।তার বাবা একজন মিস্ত্রি । যিনি ভ্যান ,সাইকেল ও মোটর সাইকেল মেরামত করেন ।রাসেল ও ছোট বেলা থেকে পড়া লেখার পাশাপাশি বাবার কাজে সাহায্য করত ।রাসেল অনেক কষ্টে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম, এ পাশ করে । বাবা মায়ের সপ্নের ডানা মেলতে থাকে তাদের ছেলে চাকুরি পাবে ।রাসেল ও সপ্ন দেখে সরকারি চাকুরি পাবে ।সে চাকুরির অনেক পরিক্ষায় অংশ নেয় কিন্তু কোথাও চাকরি পায় না । অবশেষে সে কারিগরি বা ভিত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহন করে সাবলম্বী হওয়ার পথে এগিয়ে গেছে ।মজার ব্যাপার হলো সে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে মটর মেরামতের কাজ শিখেছে যা সে আগে থেকেই জানত যা তার পারিবারিক ব্যবসা । আজ এই সময়ে তার উপলদ্বি সে যদি লেখা পড়া না করে মটর

মেরামতের কাজ শিখত তাহলে সে ৮/১০ লক্ষ টাকার মালিক থাকত ,তার বাড়ি ঘর অনেক উন্নত থাকত ।অথচ সে লেখা পড়া করতে গিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ হয়েছে ।তার সে দেনা শোদ করতে কয়েক বছর লেগে যাবে ।

রাসেল এখন বিবাহিত । তার স্ত্রী ও উচ্চশিক্ষিত বেকার ।স্বামী ও স্ত্রী দুজনে মিলেও সঃসার চালাতে হিম শিম খাচ্ছে । দুজনে উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেট তেমন কোন উপকার করতে পারছে না ।

আজ রাসেল অতীতের অনেক বিষয় মনে করে দুঃখ পায় ।কারন এক সময় সে টিউশানি করে অনেক টাকা রোজগার করত কিন্তু সঞ্চয় করেনি । তাই আজ তাকে সামান্য প্রয়োজনেও অন্যের কাছ থেকে ধার করে চলতে হয় ।

রাসেল আজ বঝুতে পেরেছে অর্থের উপার্জনের চেয়ে অর্থের সঠিক ব্যবস্থা পনা জানাটা জুরুরী অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্তে প্রবাসী ভাই একই ভুল করে থাকে ।

রাসেলের বয়স এখন ৪০ এর কাছাকাছি এখনি তাকে ডায়বেটিসে ধরেছে ।অর্থ নৈতিক কারনে মনও ভাল থাকে না । ডায়বেটিস বা অন্য রোগ দেখা দিলে সে ডাক্তারের কাছে যায় কিন্তু মনে নানা কষ্ঠ থেকেই যায় ?

মন কী ?

কোথায় থাকে মন ?

তার প্রশ্ন দেহের মত মনের ও কি অসুখ হয়

আসলে মন মস্তিষ্কেরই অঃশ ।চিন্তা ,চেতনা , বুদ্ধি বৃত্তির সাথে সম্পৃক্ত ।আমরা দেহ দেখতে পাই , মন দেখা যায় না । আবেগ, অনুভূতি, আচার আচরন এবং নানাবিধ ,ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে মনের চিএ বাইরে বেড়িয়ে আসে প্রতিভাত হয় ।দেহের যেমন অসুখ হয় মনের ও অসুখ হয় কিন্তু মন চিরকাল অবহেলায় পড়ে থাকে ।মনের চিকিৎসা হয় না ।রাসেল আজ বিভ্রশ,বিষনতায় ডুবে থাকে ?সে ভাবে বাবা মা আমার জন্য কি করেছে ?

আসলে সে অতীতের কথা ভুলে গেছে ।ছোট বেলা থেকে তাকে মানুষ করতে গিয়ে বাবা মা অনেক কষ্ট স্বীকার করেছে ।তাকে পড়ালেখা করাতে গিয়ে তার পিছনে অনেক টাকা খরচ করেছে কিন্তু তার হিসাব নেই। বাবা মা হিসাব রাখে নি রাসেল ও হিসাব রাখেনি।রাসেলের উচিত ছিল সকল অর্থের হিসাব রাখা।বিশেষ করে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকে ।বর্তমানে বাবা নগদ টাকা দিতে পারে না বলে বাবা-মা কে সে ভাল চোখে দেখে না ।তাদের ছালাম দেয় না ।সংসারে নানা ধরনের ঘটনা ঘটে ,এসব ঘটনা আমাদের কতটা প্রভাব ফেলবে তা নির্ভর করে আমরা কী রিয়্যাক্ট করি তার উপর । মনে করুন রফিক সাহেব অফিস যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে নাস্তা করতে বসেছে ।তার ক্লাস টু এ পড়া মেয়েও তার সাথে নাস্তা করতে বসেছে ।এমন সময় মেয়ের হাত লেগে কফির কাপ রফিক সাহেবের জামায় পড়ে গেল।তিনি তো ভীষণ রেগে গেলেন,মেয়ে বাবার রাগ দেখে কান্না করতে লাগল,

ইতিমধ্যে স্কুল বাস এসে চলে গেল।মেয়ে স্কুল বাস মিস করল।তিনি আবার রেডি হয়ে এসে দেখলেন মেয়ে কান্না করছে ।তার বউ বলল মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দিতে ।তিনি রেগে মেগে মেয়েকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে অফিস চলে গেলেন, অফিস গিয়ে দেখলেন তার প্রয়োজনীয় ফাইল ও ল্যাপ্টপ বাসায় রেখে গেছেন।আবার বাসায় আসলেন বউয়ের সাথে রাগারাগি করে অফিস চলে গেলেন ।

অফিস শেষে রফিক সাহেব রাতে বাসায় ফিরে দেখলেন স্ত্রী সন্তান ঘুমিয়ে গেছেনু একা একা খাবার খেয়ে ঘুমাতে গেলেন কিন্তু কষ্ঠে ঘুম আসেনা ,নানা চিন্তায় ডুবে থাকে মন।

এবার সকালের ঘটনায় ফিরে যাই ।জামায় কফি ফেলার ঘটনার পর রফিক সাহেব রাগ না করে যদি বলতেন আম্মু কোন ব্যাপার না আমরা ছোট বেলায় কত কফি ফেলছি বাবার জামায় ।তাহলে সব ঠিকভাবে চলত মেয়ে স্কুলে বাস মিস করত না । তিনি তাড়াহুড়া করে বাসায় ল্যাপটপ ফেলে যেতেন না , বউয়ের সাথে রাগারাগি হতো না।দিনটি সুন্দর কাট তো।

তাই কোনো বিষয়ে রিয়্যাক্ট করার আগে ৩০ সেকেন্ড সময় নিন জীবন সুন্দর হবে ।

ইসলামী ইতিহাস

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামকে শুধু একটি ধর্ম নয় রাষ্ট্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার অন্তর্ধানের পর ইসলামী সরকার ব্যবস্থা যেভাবে পরিচালিত হয়েছে তাকে বলা হয় খিলাফাত। খিলাফত সরকার ব্যবস্থার প্রধান হলেন একজন খলিফা। ৬৩২ খ্রী: আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুরু করে ১৯২৪ সালে সর্বশেষ অটোমান খলিফা পর্যন্ত প্রায় এক হাজার তিনশ বছর খিলাফত শাসন ব্যবস্থা কায়েম ছিলো।

এই সুদীর্ঘ সময়ে খলিফা উপাধির কার্যকরী ব্যবহারের পাশাপাশি বহু অপব্যবহারও হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম ছিলেন একই সাথে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা এবং ন্যায়পরায়ন রাষ্ট্রনায়ক। তার চলে যাবার পর এই দুটি মহান গুণ কোন এক ব্যক্তির মধ্যে খুঁজে পাওয়াটা ছিল অসম্ভব। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের একতা ধরে রাখার জন্য এবং ইসলামকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একজন নেতা নির্বাচন করাটা ছিল অতি জরুরী। সেজন্যই একজন খলিফার অধীনে খিলাফত ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। খলিফা শব্দের আভিধানিক অর্থ হল উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধিত্বকারী। ইসলামি পরিভাষায় খলিফা হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি যাবতীয় বিষয়ে শরীয়ত অনুযায়ী সমস্ত উম্মতকে পরিচালিত করেন। সেজন্য তাকে বলা হয় খলিফাতুর রাসুলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের উত্তরাধিকারী।

খলিফা হবার জন্য কয়েকটি যোগ্যতা এবং শর্ত রয়েছে। প্রধান কয়েকটি শর্ত হলোঃ

- মুসলিম হওয়া।
- প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া
- নেতৃত্ব গ্রহণের প্রতি আগ্রহ না থাকা।
- পুরুষ হওয়া।
- স্বাধীন হওয়া।
- ন্যায়পরায়ণ হওয়া।
- বিবেকসম্পন্ন হওয়া।
- ইলম বা জ্ঞান থাকা ।
- সুন্নতের অনুসারী হওয়া।
- উম্মাহ দরদী হওয়া।

১. প্রথম খুলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ৬৩২ থেকে ৬৩৪ সাল পর্যন্ত মাত্র দুই বছর খলিফা দায়িত্ব পালন করেন।তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন।

২.ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৩৪ থেকে ৬৪৪ সাল পর্যন্ত ১০ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। তার সময় মূলত ইসলামী শাসনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।খলিফা ওমর এর নেতৃত্বে পারস্য এবং বাইজেন্টাইন

সাম্রাজ্যের মতো তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তিকে মুসলিমরা দমন করতে সক্ষম হয়। খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আমলেই মুসলিমরা পবিত্র জেরুজালেম শহরের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে।

৩. উনার পরে ওসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৪৪ সাল থেকে ৬৫৬ সাল পর্যন্ত ১২ বছর ইসলামি সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তার সময়ে ইসলামিক খেলাফত তৎকালীন খোরাসান বা বর্তমান আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

৪. এরপর আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৫৬ থেকে ৬৬১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর খলিফার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি খিলাফতের রাজধানী মদিনা থেকে ইরাকের কুফাতে স্থানান্তর করেছিলেন। অনেকে তার পুত্র হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফার মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাদে বাকি তিনজনই হত্যার শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে শুধু উমর রাঃ অমুসলিমের হাতে খুন হন। বাকি দুজনকে মুসলিম বিদ্রোহীরা হত্যা করেছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামের অন্তর্ধানের মাত্র তিন দশক পরেই প্রকৃত কুরআনের শাসন বাধা প্রাপ্ত হয় ।

ইসলামি শাসনের পরিধি বিস্তৃত হবার সাথে সাথে মুসলিমরা নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু করেছিল। প্রচুর ক্ষমতা আর অর্থ বৃত্তের কারণে খলিফা পদ গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা এবং রাজনৈতিক চক্রান্ত নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়।

খোলাফায়ে রাশাদীনের পর মুসলিমদের নেতৃত্ব দিতে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্য দিয়ে খিলাফত আর সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থাকেনা। প্রথম উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া তার পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে। এটি ছিলো খলিফা নির্বাচনের প্রচলিত ধারায় বিশাল কুঠারাঘাত। এর ফলে খিলাফত ব্যবস্থা এক ধরনের রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। আর খলিফা হয়ে যায় অনেকটা সম্রাটের মতো। উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী ছিল দামেস্ক। যা বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী।

৬৬১ থেকে ৭৫০ সাল পর্যন্ত ১৪ জন খলিফা প্রায় ৯০ বছর শাসনের পর উমাইয়া খিলাফতের পতন হয়। এরপর যাত্রা আব্বাসীয় খেলাফতের। আব্বাসীয় শাসকগণ ৭৫০ থেকে ১২৫৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০৮ বছর খিলাফত কায়েম রাখতে সক্ষম হয়।

আব্বাসীয় খেলাফতের রাজধানী ছিল বাগদাদ। প্রায় ৫০০ বছরে ৩৭ জন শাসকের ক্ষমতার পালা বদলে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন ঘটে। শেষের দিকে আব্বাসীয় শাসকেরা সুলতান সহ অন্যান্য কিছু উপাধি গ্রহণ করেন। আব্বাসীয় খিলাফতের পরে ১২৬১ সালে আসে মামলুক আব্বাসীয় রাজবংশ ।

মিশরের কায়রো ভিত্তিক এই রাজবংশ প্রায় ২৫৬ বছর রাজত্ব করে। ১২৬১ থেকে ১৫১৭ সাল পর্যন্ত ১৭ জন শাসক এই খিলাফত পরিচালনা করেছেন ।

মামলুক সালতানাতের পর ক্ষমতায় আসে উসমানীও খিলাফাত। ১৫১৭ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০৭ বছর উসমানীয় খিলাফত বজায় ছিল। উসমানীয় খিলাফতের শাসকদের সুলতান নামে ডাকা হতো। প্রায় ৩০ জন শাসক উসমানীয় খিলাফত ব্যবস্থায় খলিফার দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রধান পাঁচটি বৈশ্বিক খিলাফত ছাড়াও বেশ কিছু আঞ্চলিক খেলাফতেরও নজির রয়েছে। সেগুলো হলোঃ ১. আব্দুল্লাহ ইবনুস জুবায়ের এর খিলাফত

২.কর্ডোভার উমাইয়া খিলাফত

৩. ফাতেমীয় খিলাফত

৪. আল আহমদিয়া খিলাফত এবং ৫.শরিফিয়া খেলাফত

এসব খিলাফতের আমলে খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়া বংশ-পরম্পরায় হয়ে আসলেও অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী শাসনের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য কোন জাতির শাসক অসৎ হলেও সেই মন্দ শাসকের জন্য সমগ্র জাতিকে দোষারোপ করা হয় না। অথচ ইসলামী খিলাফতের কোন খলিফার যদি নূন্যতম নৈতিক অবক্ষয় ঘটে থাকে তবে তার জন্য সমগ্র মুসলিম জাতি এবং ইসলাম ধর্মকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়।

ইসলামী খিলাফতের নামে সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে ২০১৪ সালে। একটি সন্ত্রাসী সংগঠন ইসলামী স্টেট অফ ইরাক এন্ড লেবার (ওঝওখ) গড়ে তোলে যা **ওংষধসরপ ঝঃধঃব ড়ভ ওৎধয় ধহফ ঝুৎরধ** বা (ওঝওঝ) নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে তারা ইসলামী খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানায় এবং আবুবকর আল বাগদাদী নামের এক ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ মুসলিমই এই খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান করে।মুসলিম নামধারী এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কারণে ব্যাপক সহিংসতা রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপে ইরাক এবং সিরিয়া নরকে পরিণত হয়। **ওংষধসরপ ঝঃধঃব ড়ভ ওৎধয় ধহফ ঝুৎরধ** বা (ওঝওঝ) মূলত পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা দিয়ে মুসলিমদের শান্তি প্রিয় ধর্মটাকেই ছিনতাই করেছে। ওদের কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের নূন্যতম সম্পর্ক নেই। ইসলামের ছদ্দবেশী এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কারণে সমগ্র বিশ্বের মুসলিমরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ওঝওঝ এর কারণে পৃথিবীতে ইসলাম ও ফোবিয়া বা ইসলামভীতি মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।

মনে রাখা উচিত একজন যোগ্য খলিফা সবসময় নিজেকে অযোগ্য মনে করবেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তার আগ্রহী থাকবে না। সেই সাথে এই গুরু দায়িত্ব বহনের জন্য মহান আল্লাহর কাছে জবাবদিহি তার ভয় করবেন।

ওঝওঝ এর মতই বর্তমান যুগের ধর্ম ব্যবসায়ীরাও ইসলামের প্রকৃত আদর্শ থেকে দূরে রয়েছে। সে কারণেই তাদের সহিংস সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে আর যাই হোক খিলাফতের মত পবিত্র শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংসের লোমহর্ষক কাহিনী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর ইসলাম এবং মুসলমানদের শক্তি ও শান্তি শৃঙ্খলার উৎস ছিল নিযামে খিলাফাত বা সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক খিলাফত ব্যবস্থা। সেই ধারাবাহিকতায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম খলীফা মনোনীত হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাখি।

তাঁর পর খলীফা নিযুক্ত হন হযরত উমর রাযি. এই দুই খলীফার কালজয়ী আদর্শ শাসনে ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও সফলতা যখন পরিস্ফুটিত ও সু- প্রমাণিত হয়ে প্রকাশ পায় তখনই ইয়াহুদী খৃষ্টান চক্র তাদের সকল ষড়যন্ত্রের মূল টার্গেট বানায় 'নিযামে খিলাফাত' কে। নতুন করে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করে মুসলিম উম্মাহর উন্নতি ও অগ্রগতির মূল শক্তি খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার দুরভিসন্ধিতে ইসলামের তৃতীয় খলীফা আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান যিন্নুরাইন রাযি. এর খিলাফতকালের প্রাথমিক পর্যায়ে হিজরী ২৫ সনে ছদ্মবেশ ধারণ করে মুসলমান দলভুক্ত হয় আব্দুল্লাহ বিন সাবা নামে এক কুখ্যাত ইয়াহুদী মুনাফিক।

এসময় হযরত উসমান রাযি. এর নেতৃত্বে পারস্য, মিশর, সিরিয়া ও ইরাক ইত্যাদি অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর লক্ষ লক্ষ লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার হিড়িক চলছিল। এর মধ্য আব্দুল্লাহ বিন সাবা ছাড়াও তার মত আরো অনেক সংখ্যক মুনাফিক ইসলামের মূলে আঘাত হানার মানসে বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করে।

ইবনে সাবার নানাবিধ অপকৌশল

ধুরন্ধর ইবনে সাবা নতুন এই সকল মুনাফিক ও পুরাতন মুনাফিক যারা হয়রত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি. এর খিলাফত কালে কখনো চোখ খোলার সাহস পেত না তাদের নিয়ে একটি গোপন দল গঠন করে। ইবনে সাবার এই দলকে বলা হয় খারিজী বা সাবায়ী দল। "নিযামে খিলাফাত" তথা মুসলমানদের সর্ব সম্মত একতাপূর্ণ সুদৃঢ় খিলাফত তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ধ্বংসের লক্ষ্য সামনে রেখে ইবনে সাবা সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা চালায় খলীফাসহ রাষ্ট্রীয় কার্যে নিয়োজিত বিভিন্ন গভর্নর সাহাবীগণের রাযি, নামে অন্যান্য লোকদের নিকট কুৎসা রটিয়ে তাদেরকে ক্ষিপ্ত করে তুলতে। সাহাবীগণের দোষ চর্চা হারাম হওয়া সত্ত্বেও এই সাবায়ী চক্র হযরত উসমানের বিরুদ্ধে নিষামে খিলাফাত ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে সম্পূর্ণ বানোয়াটভাবে দোষ চর্চার পথকে বেছে নেয়। এর পূর্বে এমন কোন জামা'আত বা দলের আবির্ভাব পৃথিবীতে ঘটেনি যারা সাহাবী রাখি, না হয়েও সাহাবীগণের রাখি, দোষ চর্চার কল্পনা করেছে। অবশ্য এই বানোয়াট দোষ চর্চার পথ অবলম্বন করে তারা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। একজন সাহাবীর রাখি, নিকট মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন সাবা হযরত মুআবিয়া রাযি, সম্পর্কে মিথ্যা সমালোচনা করলে তিনি তাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন- তুই কে? কসম খোদার আমার ধারণা তুই কোন ইয়াহুদীর বাচ্চা। আরেকজন সাহাবীর রাযি. নিকট গিয়ে হযরত মুআবিয়ার রাযি. সম্পর্কে মিথ্যা সমালোচনা করলে তিনি তাকে পাকড়াও করে হযরত মুআবিয়ার দরবারে উপস্থিত করেন। হযরত মুআবিয়া রাখি, সুমদয় ঘটনা খলীফা উসমান রাযি. এর নিকট জানিয়ে পাঠান। হযরত উসমান রাযি. এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যার বিবরণ বক্ষ্যমাণ আলোচনায় বিধৃত হয়েছে। উল্লেখ্য ইবনে সাবা এ সময়ে সিরিয়ায় অবস্থান করছিল এবং সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন তখন হযরত মুআবিয়া রাযি.

অতঃপর ইবনে সাবা সিরিয়া হতে বসরায় এসে এখানকার এক পুরাতন দাগী সন্ত্রাসী ডাকাতের বাড়ীতে বসে আরো কতিপয় লোককে নিয়ে এক গোপন বৈঠক করে। সেখানে সাংকেতিক ভাষায় একটি কার্য পরিচালনার প্রস্তাব করলে তা গৃহীত হয়। বসরার গভর্নর গোপন সূত্রে এই সংবাদ পেয়ে

তাকে বসরা হতে বহিস্কার করলেন। ফলে সেখান থেকে সে কুফায় চলে যায়। কিছুদিন পর সেখান হতেও বহিষ্কৃত হয়ে মিশরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর এরই মধ্যে সে বসরা ও কুফায় তার অনুসারীদের সমন্বয়ে গোপন দলের একটি স্থানীয় কমিটি তথ্য ষড়যন্ত্রকারী দল গঠন করে দিয়ে

মিশরে গিয়ে সে তার কেন্দ্রীয় দফতর ও প্রধান ঘাটি স্থাপন করে এবং বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষতঃ বসরা ও কুফায় অবস্থানরত তার সুসংগঠিত অনুসারীদের সঙ্গে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে সর্বদা যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। তাদের মাধ্যমে সে মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাখি, এর বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করা আরম্ভ করে। তার স্বজনপ্রীতি বংশের লোকদের চাকুরীর ক্ষেত্রে অধিক সুযোগ- সুবিধা প্রদান ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ অধিক হারে তাদের মাঝে বন্টনের কম্পিত অভিযোগ উত্থাপন করে। অধিকন্তু তাকে (হযরত উসমান রাযি.)ক েআরো বেশী দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন সাবার সহকর্মীরা আরো অনেক গভর্নর সাহাবীর রাযি, বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে। এরূপ ষড়যন্ত্রকারী খারিজীরা খলীফা হযরত উসমান রাযি. এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অতিরঞ্জনকেই বড় অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। এমন কি তারা এসব কম্পিত মিথ্যা অপবাদগুলোকে এরূপ ব্যাপকভাবে পুথি পুস্তকাকারে সর্বত্র প্রচার করে যে, সেগুলো পরবর্তীতে বে-মালুম ইতিহাসে পরিণত হয়ে যায়।

এমনিভাবে আব্দুল্লাহ বিন সাবা নতুন পুরাতন মুনাফিকদের একত্রিত করে এবং মদীনার দু'জন থ স্বার্থান্বেষী খান্দানী মুসলমান যাদের সাহাবী রাযি. হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়নি অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন আবু বকর ও মুহাম্মদ বিন হুযাইফাকে ভিড়িয়ে উক্ত সন্ত্রাসী দল মিথ্যার বহর ছড়াতে ও মুসলমানদের শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত করার অপচেষ্টা করে।

এই উদ্দেশ্যে ইবনে সাবার দল পুথি-পুস্তকাকারে মিথ্যার বহর এমন ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, পরবর্তী অনেক ইতিহাস লেখকগণ সেসব মিথ্যা গুজব সর্বস্ব পুথি পুস্তক দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। তারই কলঙ্কিত নজীর হচ্ছে মীর মোশারারফ হোসেনের বহু পুরাতন উপন্যাস "বিষাদ সিন্ধুচ যার আদ্যোপান্ত শুধু অলীক, মথ্যিা, বাননোয়াট ও কাল্পনিক কাহিনী এবং সে সকল মুনাফিকদের প্রচারিত মিথ্যা তথ্য ও ঘটনাবলীর দ্বারা পরিপূর্ণ। উল্লেখ্য এই মীর মোশারারফ হোসেন শিয়া ছিলেন।

<u>যুগে যুগে ইয়াহুদী-খৃষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র</u>

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

"হে নবী! ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের (পরিপূর্ণ) অনুগত হয়ে যান। (অর্থাৎ আপনি ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান না হওয়া পর্যন্ত তারা আপনার কথা মানবে না।) আপনি বলে দিন আল্লাহু যে পথ প্রদর্শন করেছেন তা প্রকৃত হিদায়াতের পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহ পূরণে তৎপর হন ওহীর ঐ অকাট্য জ্ঞান লাভের পর-যা আপনার কাছে পৌঁছেছে তবে আল্লাহ থেকে আপনার জন্য কোন সাহায্যকারী কেউ থাকবে না।চ (সূরাহ্ বাক্বারাঃ ১২০)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলমানরা যতদিন পর্যন্ত তাদের প্রভু প্রদত্ত দীন-ইসলামকে পরিত্যাগ করে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ধর্ম গ্রহণ না করবে ততদিন পর্যন্ত ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা মুসলমানদের

প্রতি সম্ভাব পোষণকারী হবে না। এমনকি আল্লাহুর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বেলায়ও তাদের এ মানসিকতা প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল। তাদের আন্তরিক কামনা ও লক্ষ্য একটিই। আর তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র মুসলিম জাতি ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করুক আর দুনিয়াতে ইসলামের নাম- নিশানা পর্যন্ত বাকী না থাকুক। এ কারণে ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শুধু ষড়যন্ত্র করেই 'আসছে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে মদীনা প্রধানতঃ আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় মুশরিক আর ইয়াহুদী ও নাসারাদের আবাসস্থল ছিল। নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পূর্বেই আওস ও খাযরাজ গোত্রের কাফির মুশরিকদের মধ্য হতে অনেকে হজ্জের মওসুমে মক্কাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত কবুল করে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

পক্ষান্তরে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা শুধুমাত্র হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করা হতে কেবল বিরতই থাকেনি বরং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে সর্বদাই তারা নানা ফন্দি ফিকির আটতে থাকে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্বেও এই ইয়াহুদী খৃষ্টানরা আওস ও খযরাজ গোত্রের হাতে বার বার প্রহৃত হওয়ার পরিণতিতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও নিজেদের আত্মতৃপ্তি লাভের উদ্দেশ্যে তাদের "আসমানী কিতাবের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে এ কথাই বলতো যে অতিসত্বর এই ভূমিতে খাতামুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ আখিরী নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবির্ভাব ঘটবে। আমরা তখন তাঁর দীন কবুল করে তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করে তোমাদের পরাজিত করবো। কারণ তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আবির্ভাবের সময় ও স্থানসহ তার পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় আগমনের পর ইয়াহুদী খৃষ্টানদের ইসলাম কবুল না করা সত্ত্বেও শান্তি ও সহাবস্থানের লক্ষ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি স্থাপন করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি স্থাপন করে ছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে তিনটি ইয়াহুদী গোত্র ছিল উল্লেখযোগ্য যথাক্রমে বুন ক্বাইনুক্বা, বনু নজীর ও বনু কুরাইজা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ রাযি. উল্লেখিত চুক্তির সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করতে থাকেন। কিন্তু ইয়াহুদী- খৃষ্টান জাতি তাদের গোঁয়ার্তুমি ও হঠকারিতার কলঙ্কিত ঐতিহ্য ও মজ্জাগত বদ স্বভাবের পরিচয় দিয়ে নানাভাবে চুক্তির বরখেলাপ করে জঘন্যতম কর্মকাণ্ড ঘটাতে থাকে। এক দিকে বিপুলসংখ্যক ইয়াহুদী প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করে ছদ্ম-বেশে মুনাফিকরূপে মুসলমানদের মাঝে অনুপ্রবেশ করতঃ ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করতে তৎপর হয়। অপরদিকে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতাকারী ইয়াহুদীরা মক্কার মূর্তিপূজক কাফির মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের অপকর্মসমূহের কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

<u>দৃষ্টান্ত -১</u>

একবার এক আরব্য রমণী বনু ক্বাইনুক্বার বাজারে গেলে এক দোকানদার দুষ্টামির ছলে তার কাপড় খুলে উলঙ্গ করে দেয় এবং তাকে নিয়ে খুব হাসি ঠাট্টা করে। সেই মহিলার চিৎকার শুনে এক আরব্য ব্যক্তি এগিয়ে আসে এবং দোকানদারকে হত্যা করে ফেলে। তখন অন্যান্য ইয়াহুদীরা জড়ো হয় এবং উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরব ও ইয়াহুদীদের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায়। ঘটনাটি অবহিত হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরীফ আনেন এবং বিবাদকারীদের তিরস্কার করেন। এতে বনু ক্বাইনুক্বার লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে মুসলমানদের বলতে লাগলো যে তোমরা বদর যুদ্ধের

বিজয়ে বেশী গর্ব করো না। কারণ তারা (কুরাইশরা) তোমাদের সমগোত্রীয় ছিল, তারা যুদ্ধ করতে শিখেনি। ফলে তোমাদের বিজয় সম্ভব হয়েছে। তবে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে বুঝতে পারবে যোদ্ধা কাকে বলে। এরূপ দম্ভোক্তি করে তারা ইতিপূর্বে তাদের সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দেয়। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতিরোধ পাল্টা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। পনের দিন পর্যন্ত তাদের অবরোধ করে রাখা হয় অতঃপর তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অবশেষে তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যে কোন সিদ্ধান্তের প্রতি নিঃশর্ত সম্মতি জ্ঞাপনে বাধ্য হয়। সুতরাং উক্ত ইয়াহুদী গোত্রকে মদীনা হতে বহিষ্কার করা হয়।

দৃষ্টান্ত-২

ইয়াহুদী গোত্র বনু নজীরের সাথে অপর এক আরব্য গোত্রের বিরোধ হলে, এর মীমাংসা করতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক'জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবীকে রাযি. সঙ্গে নিয়ে বনু নজীরের এলাকায় গমন করেন। বাহ্যতঃ তারা তখন আন্তরিকতা ও আতিথেয়তার মনোভাব প্রদর্শন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সসম্মানে একটি দেয়ালের নিকট বসতে দেয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা দেয়ালের উপর হতে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শহীদ করে দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পাষণ্ড আমর বিন হাজ্জাশ এই জঘন্য কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে দেয়ালের উপর অবস্থান নেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহীর মাধ্যমে তাদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে নিঃশব্দে তথা হতে উঠে আসেন। এই ঘটনার পর তিনি বনু

দিল নজীরকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। এ সময় সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর মদীনায় তাদের যে কোন ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে তাকে হত্যা করা হবে বলে সাথে সাথে জানিয়ে দেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ পেয়ে বনু নজীর মদীনা ত্যাগের জন্য তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের প্ররোচনায় ও তার পক্ষ হতে সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এই উত্তর পাঠায় যে, আমরা কোন ক্রমেই মদীনা ত্যাগ করবো না। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন। তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকেও মদীনা ত্যাগে বাধ্য করেন। অতঃপর তারা দেশান্তরিত হয়ে খাইবার নামক স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে।

দৃষ্টান্ত-৩

পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। এবার ইয়াহুদীরা মুসলমানদেরকে সমূলে শেষ করে দিতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। নেতৃস্থানীয় ক'জন ইয়াহুদী আরবের অন্যান্য সকল কাফির গোত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে মক্কার কুরাইশ, বনু সালীম, বনু গাতফান, বনু আসাদ, আশজা, ফাযারাহ, বনু মুররাহ এ সকল গোত্রের কাফিরদের সমন্বয়ে বহুজাতিক বাহিনী গঠন করতঃ সকলে এক সঙ্গে মদীনা আক্রমণ করার পরিকল্পনা আটে। পরিকল্পনা মুতাবিক তাদের দশ হাজার সৈন্যর বিশাল বাহিনী মুসলমানদের উপর যুগপৎ আক্রমণ চালায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সকল সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে সঙ্গে নিয়ে কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে মদীনার চতুর্পার্শ্বে পরিখা খননে লিপ্ত হন। মদীনায় তখন কেবল নারী ও শিশুরা ছিল। এরই মধ্যে মদীনায় অবস্থানকারী ইয়াহুদীদের তৃতীয় গোত্র বনু কুরাইজাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা দিয়ে কাফিরদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধের চরম মূহুর্তে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন এক দল সাহাবী রাযি. কে মদীনায় নারী ও শিশুদের দেখা-শুনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতে নির্দেশ দেন। তথাপি খন্দক প্রান্তরে যুদ্ধরত মুসলমানগণ সর্বদাই নিজ নিজ পরিবার পরিজনের উপর বনু কুরাইজার ইয়াহুদীদের আক্রমণের আশংকার উদ্বিগ্ন ছিলেন। দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত কাফির বাহিনী মদীনা অবরোধ করে রাখে, কিন্তু সমর বিশেষজ্ঞ সাহাবী

হযরত সালমান ফার্সী রাযি. এর পরামর্শ মুতাবিক খন্দক বা পরিখা খনন করে রাখায় কাফিরদের পক্ষে তা অতিক্রম করে মদীনায় প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে শত্রু দল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কাফিররা মদীনা ছেড়ে যেতে বাধ্য

হয়। আল্লাহ তা' আলার বিশেষ রহমত ও সাহায্যে মুসলমানরা এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসে তা খন্দক যুদ্ধ নামে পরিচিত। খন্দক যুদ্ধ হতে মদীনা প্রত্যাবর্তন করে কোনরূপ বিশ্রাম গ্রহণের পূর্বেই হযরত জিবরাইল আ. আল্লাহ তা' আলার পক্ষ হতে বনু কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তির বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে সেদিন 'আসরের নামাযের পূর্বেই ব কুরাইজার এলাকায় পৌঁছার নির্দেশ দেন। বনু কুরাইজাহ তখন তাদের নির্মিত দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। পঁচিশ দিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করে রাখা হয়। এই দীর্ঘ অবরোধে তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে।

তখন তাদের নেতা কাব বিন আসাদ বললো এখন মুক্তির পথ এইটাই যে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাও। কেননা, তোমাদের সকলেরই জানা আছে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী। যদি এ পথ তোমাদের নিকট পছন্দনীয় না হয় তাহলে সবাই স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে জীবনের মায়া ত্যাগ করে চূড়ান্ত যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে হয় বিজয় অর্জন কর নতুবা সকলেই আত্মাহুতি দাও। আর যদি তোমাদের পক্ষে তাও সম্ভব না হয় তাহলে তোমাদের ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন করে পবিত্র শনিবারে অতর্কিত হামলা কর। কেননা এদিন মুসলমানগণ এ বিশ্বাসে অপ্রস্তুত থাকবে যে, আমরা শনিবারের পবিত্রতা রক্ষার্থে এদিন যুদ্ধ করবো না। বনু কুরাইজার লোকেরা কাব বিন আসাদের প্রস্তাবিত কোন পন্থাই গ্রহণ না করে হযরত আবু লুবাবা রাযি. এর সঙ্গে পরামর্শ করতঃ বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। আওস গোত্রের সঙ্গে বনু কুরাইজার মিত্রতা থাকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু কুরাইজার ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আওসের লৌহ পুরুষ, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সা'আদ বিন মু'আয রাযি. এর হাতে অর্পণ করলেন। বনু কুরাইজার কৃত অপরাধের উচিৎ শাস্তি স্বরূপ তিনি তাদের যুদ্ধক্ষম সকল পুরুষকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদের বন্দী করার সিদ্ধান্ত দেন। তারই সিদ্ধান্ত মুতাবিক বনু কুরাইজার নেতা কাব বনু নজীর নেতা হুয়াই বিন আখতাবসহ ছয় শতাধিক যুদ্ধাপরাধী বন্দীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

<u>দৃষ্টান্ত-৪</u>

বনু নজীরকে খাইবারে বহিস্কার করার পর খাইবার নতুন করে ষড়যন্ত্রকারীদের আখড়ায় পরিণত হয়। এখানে বসে বসে ইয়াহুদী ও ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র করতো। বনু নজীর নেতা হুয়াই বিন আখতাব খন্দক যুদ্ধের সময় খাইবার হতে মদীনায় গিয়ে তথায় অবস্থানকারী বনু কুরাইজাকে বিশ্বাসঘাতকতায় প্ররোচিত করে। এ কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে সপ্তম হিজরীতে খাইবার অভিযান পরিচালনা করেন। অষ্ট দূর্গে পরিবেষ্টিত খাইবার ইয়াহুদীদের অত্যন্ত শক্তিশালী ঘাটি ছিল। এখানে শত্রু পক্ষের কিছু শক্তিশালী যোদ্ধারও অবস্থান ছিল। তাই এ যুদ্ধ জয় করতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামকে রাযি. কঠোর পরিশ্রম ও চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যখন পাঁচটি দুর্গ বিজিত হয় তখন ইয়াহুদীরা আত্মরক্ষার নিমিত্তে শেষ চেষ্টা স্বরূপ অবশিষ্ট তিন দুর্গে আশ্রয় নেয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কে নিয়ে সেগুলো অবরোধ করে রাখেন।

দীর্ঘ চৌদ্দ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন ইয়াহুদীরা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছিল না তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মিনজানিক' নামক হস্তচালিত বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপক কামান মোতায়েন করে দুর্গ ভাঙ্গার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহুদীরা আলোচনার অনুমতি প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সম্মত হন।

অতঃপর আলোচনায় এ সিদ্ধান্ত হলো যে দুর্গে অবস্থানকারী সকলকে মুক্তি দেয়া হবে। তবে সঙ্গে কোন প্রকার সম্পদ ও যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যেতে পারবে না। পরিহিত কাপড় ব্যতীত অন্য কোন ব্যবহার্য জিনিস পত্রও সাথে করে নিতে পারবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে ঘোষণা করে দেয়া হয় কেউ কোন কিছু গোপন করলে তার জানের নিরাপত্তা বহাল থাকবে না। সে মুতাবিক সম্পদ লুকানোর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর দু' জনকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

<u>দৃষ্টান্ত-৫</u>

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিষ প্রয়োগে হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্রঃ খাইবার যুদ্ধের পরে ঘটনা। যুদ্ধশেষে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে আসার পর এক ইয়াহুদী মহিলা একটি ছাগল রান্না করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে তা হাদিয়া হিসেবে পেশ করল। তাতে সে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হতে এক টুকরা গোস্ত উঠিয়ে মুখে দিলে গোশতের টুকরাটিই বলে দিল যে, তাতে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল আ. এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বিষ প্রয়োগের কথা জানিয়ে ছিলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশতের টুকরাটি মুখ থেকে ফেলে দেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই একজন সাহাবী রাযি. বিষ প্রয়োগের কথা না জেনে ঐ বিশ মিশ্রিত গোস্ত ভক্ষণ করে ইন্তিকাল করেন। এ ঘটনার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলাকে ডেকে বিষ প্রয়োগের কথা জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর আমি এ জন্য বিষ মিশ্রিত করেছি যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। আর যদি আপনি মিথ্যা নবী হয়ে থাকেন তাহলে আমরা আপনার হাত থেকে মুক্তি পাবো।

ইমাম যুহুরী রহ. বর্ণনা করেন যে, উক্ত মহিলা মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা ও মুক্ত করে দেন। কিন্তু অন্য বর্ণনা মতে জানা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত সাহাবীর রাযি. ইন্তিকালের ঘটনার পর উক্ত মহিলাকে কিসাস স্বরূপ হত্যার নির্দেশ দেন। খাইবারের এই বিষ প্রয়োগের ঘটনার তিন বছর পর যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু যাতনায় ভুগছিলেন, তখন তিনি এই বলছিলেন যে, "খাইবারের বিষ ক্রিয়াই এখন আমার মধ্যে দেখা দিয়েছে। এজন্য ইমাম যুহরী রহ. বলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাতের মৃত্যু লাভ করেছেন।

আল-আকসা

ইসলামের অন্যতম গুরুত্ববাহী একটি জায়গা আল আকসা মসজিদ। যা মসজিদুল আকসা নামে পরিচিত। পবিত্রতার দিক থেকে মক্কা ও মদিনার পরেই মসজিদুল আকসার অবস্থান।

কাবা শরীফের পূর্বে এই মসজিদ মুসলমানদের প্রথম কেবলা ছিল। আল কোরআনে উল্লেখিত পবিত্র স্থান গুলোর মধ্যে মসজিদুল আকসা অন্যতম। বর্তমানে মসজিদটি মুসলমানদের অধিকারে থাকলেও ভৌগোলিকভাবে এই অঞ্চল দখল করে রেখেছে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে পবিত্র কাবাঘর নির্মাণের ৪০ বছর পর হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জেরুজালেমের মসজিদটি নির্মাণ করেন।

পরবর্তীতে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের নির্দেশে হযরত সুলাইমান আলাইহি সালাম মসজিদটি পুনঃনির্মাণ করেন।পূর্বে এর নাম ছিলো বাইতুল মাকদিছ। পরবর্তীতে কুরআন শরীফে এর নামকরণ করা হয় আল মাসজিদুল

আকসা।

মসজিদুল আকসা অর্থ দূরের মসজিদ। নবী করীম (সাঃ) মক্কার মসজিদুল হারাম, মদিনার মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসার উদ্দেশ্যে সফরকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। হাদীসে আছে হিজরতের এক বছর

আগে মিরাজের রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে বায়তুল আকসায় উপনীত হন।এরপর বুরাক কে বাইরে বেধেঁ মহানবী সাঃ মসজিদে আকসায় প্রবেশ করেন এবং সেখানে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল আকসা। মক্কা, মদিনার পরে ইসলামের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটিই পৃথিবীতে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ। মেরাজের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম মক্কা থেকে প্রথমে মসজিদে আকসায় আগমন

করেন।

<u>এক নজরে আল আকসার প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থান</u>

কোরআনের একাধিক স্থানে আল আকসাকে বরকতময় এবং পবিত্র ভূমি বলা হয়েছে। অসংখ্য নবী রাসূলের স্মৃতিধন্য এ পূণ্যভূমি দীর্ঘকাল ইসলামি শিক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অত্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। আইয়ূবী সুলতানদের নির্মিত ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মুসলিম শাসকদের অনেক স্মৃতিচিহ্ন ধারন করে আছে আল আকসার পূণ্যভূমি।

ভারত স্বাধীনতার অগ্রনায়ক এবং খেলাফত আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক মাওলানা মোহাম্মদ আলী জওহরসহ অনেক কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব সমাহিত আছেন জেরুসালেমের এ পবিত্র মাটিতে।

আল আকসা কমপ্লেক্স

প্রায় ১৪ হেক্টর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত আল আকসা কমপ্লেক্স একক কোনো স্থাপনা নয়। চার দেয়াল বেষ্টিত এ কমপ্লেক্সে মসজিদ, মিনার মেহরাব ইত্যাদি মিলিয়ে ছোট বড় প্রায় দুইশত ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে।

মুসলমানরা যেভাবে আল আকসার নিয়ন্ত্রণ হারায়

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আল আকসার নিয়ন্ত্রণ হারায় মুসলমানরা। এর আগে এটি জর্ডানের শাসকদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। বর্তমানে আকসা কমপ্লেক্স ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও মসজিদ পরিচালিত হয় জর্ডান-ফিলিস্তিনের একটি ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে। যদিও এর প্রবেশপথগুলোতে মোতায়েন করা থাকে ইহুদি দখলদার সেনারা। তারা অনেক তল্লাশির পরে মুসল্লিদেরকে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করতে দেয়।

আল আকসা নির্মাণের ইতিহাস

নির্মাণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক কারণে কয়েক দফা ধ্বংস এবং পুনঃনির্মাণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বর্তমানের আল আকসা কমপ্লেক্স। তাই আল আকসার নির্মাণ ইতিহাস দুই পর্বে আলোচনা করা হয়। ইসলাম পূর্ব যুগ ও ইসলাম পরবর্তী যুগ

ইসলাম পূর্ববর্তী যুগে আল আকসা

আল আকসা পৃথিবীতে নির্মিত দ্বিতীয় মসজিদ। মক্কায় মসজিদুল হারাম নির্মাণের ৪০ বছর পরে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। প্রথম কে আল আকসা নির্মাণ করেন তা নিশ্চিত করে জানা না গেলেও এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের তিনটি মত পাওয়া যায়।

কেউ বলেন, এই মসজিদের প্রথম নির্মাতা হলেন আদিপিতা হজরত আদম আলাইহিস সালাম। কেউ বলেন, নুহ আলাইহিস সালামের সন্তান সাম এই মসজিদের আদি নির্মাতা। আবার কারো মতে, হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম প্রথম এই মসজিদের ভিত্তি নির্মাণ করেন।

নবীদের যুগে আল আকসা

আধুনিক গবেষকরা হজরত আদম আলাইহিস সালামকে এই মসজিদের প্রথম নির্মাতা বলে মতামত দিয়েছেন। নূহ আলাইহিস সালামের মহাপ্লাবনে ধ্বংস হওয়ার পরে হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এর পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তার বংশধররা এই মসজিদের পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করেন। কালের পরিক্রমায় হজরত মুসা আলাইহিস সালামেরসহ অনেক নবী এই মসজিদের সংস্কার কাজ কাজ করেন। হজরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিস সালামের সময় পর্যন্ত অনেক সংযোজনের মধ্য দিয়ে মসজিদুল আকসা বিস্তৃত কম্পাউন্ডে রূপান্তরিত হয়।

মসজিদুল আকসা কোন একক মসজিদ নয়।

- মসজিদুল বরাক
- মসজিদে কিবলি
- মসজিদে মারওয়ানি
- মসজিদুল করিম
- তুব্বাতের সাক্রাম

এই পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মসজিদের সমন্বয়ে মসজিদুল আকসা গঠিত। এর ঠিক মাঝখানে রয়েছে গোলাকৃতি ডোম অফ দ্যা রক বা গম্বুজে সাক্রা। সাক্রা অর্থ পাথর। এটি বিশ্বের বুকে থাকা তিনটি বরকতময় পাথরের মধ্যে একটি। অপর দুটি বরকতময় পাথর হল পবিত্র মক্কার হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইব্রাহিম।

সাতাশ একর ভূমির উপর অবস্থিত এই মসজিদে একসাথে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ নামাজ আদায় করতে পারে। মসজিদুল আকসায় বিভিন্ন সময়ে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। ৭৪৬ সালে একটি ভূমিকম্পে মসজিদুল আকসা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় ।

৭৫৪ সালে আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুর পুনরায় মসজিদে নির্মাণ করেন। ৭৮০ সালে এটি আবারও সংস্কার করা হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ১০৩৩ সালে মসজিদটি আরেক ভূমিকম্পে আবার ধ্বংস হয়ে যায়।

তার দু বছর পর ফাতেমীয় খলিফা আলী আজ যাহির আবারো সেই জায়গায় মসজিদটি পুনঃ নির্মাণ করেন। বর্তমানে মসজিদুল আকসা খলিফা আলীর বানানো জায়গার উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধাপের সংস্কার কাজের সময় মসজিদের মিম্বার ও মিনারসহ বেশ কিছু অংশ সংযোজন করা হয় ।

মসজিদুল আকসার কর্তৃত্ব বহুবার হাত বদল হয়েছে। ৬৩৮ সালে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সময়ে জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকার আসে।

তার সাড়ে ৪০০ বছর পর ১০৯৬ সালে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন অঞ্চল দখল করে নেয়। সে সময় মসজিদুল আকসাকে তারা একটি গির্জায় পরিণত করে। তখন ৮৮ বছর খ্রিস্টানদের দখলে থাকার পর ১১৮৭ সালে মুসলিম বীর সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবী পুনরায় মসজিদুল আকসা সহ জেরুজালেম শহরকে মুসলমানদের অধিকারে নিয়ে আসেন।

১৯৬৭ সালে ছয়দিনের যুদ্ধ নামে খ্যাত আরব ইজরাইল যুদ্ধে ইসরাইলের বিপক্ষে মিশর, জর্ডান ও সিরিয়াল লড়াই করে। মুসলমান রা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মসজিদুল আকসা এলাকার নিয়ন্ত্রণ হারায়। তখন থেকে ফিলিস্থিনের নির্যাতিত জনগন আজও তাদের আবাসভূমি এবং মসজিদুল আকসা উদ্ধারের জন্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের ১৩ অক্টোবর জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন ইউনেস্কো ভোটগ্রহণের মাধ্যমে ঘোষণা করে যে মসজিদুল আকসা কেবলই মুসলমানদের অধিকার থাকবে এবং এখানে ইসরাইলের কোন হস্তক্ষেপ থাকবে না।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা তো দূরের কথা বরং অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল ফিলিস্তিনের নিরীহ জনগণের উপর সহিংসতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

মসজিদুল আকসা সহ সমগ্র ফিলিস্তিন অঞ্চলে অতীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি তৈরি করেছে।বৃটিশরা ভারতেও বহু মসজিদ ধ্বংস করেছে।সেই সাথে ততকালীন সময়ে ভারতের সবচেয়ে বড় মসজিদ দিল্লি জামে মসজিদকে তারা সামরিক বাহিনীর ব্যারাকে পরিণত করেছিল।

সাধারণ জ্ঞান

আল কুরআনঃ

আল কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব, যা হযরত জিব্রাইল আ. এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ স. এর উপর ধাপে ধাপে দীর্ঘ ২৩ বছরে অবতীর্ণ হয়। আল কুরআন লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল। এটি আল্লাহর বাণী ও মুসলিম জাতির পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন মাজিদে সর্বমোট ১১৪টি অধ্যায় রয়েছে যেগুলোকে আরবিতে সূরা বলা হয়। এর আয়াত সংখ্যা বিসমিল্লাহ সহ ৬৩৪৮টি, আর বিসমিল্লাহ ছাড়া ৬২৩৬টি। সূরা তাওবা ব্যতীত প্রত্যেকটা সূরায় বিসমিল্লাহ রয়েছে। সূরা নামল ২ বার বিসমিল্লাহ রয়েছে। মাক্কি ও মাদানি সূরা নিয়ে মতভেদ থাকলেও মজবুত মত অনুযায়ী মাক্কি সূরা ৮৬টি এবং মাদানি সূরা ২৮টি। হিজরত (৬২২খ্রি.) এর পূর্বে নাজিলকৃত সূরা গুলো মাক্কি সূরা, আর ৬২২ খ্রি. এর পর নাজিল হওয়া সূরা গুলো মাদানি সূরা। কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা 'সূরা ফাতেহা'। শেষ সূরা 'সূরা নাস'। সূরা ফাতেহাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়। এর সর্ববৃহৎ সূরা হলো সূরা বাকারা, যার আয়াত সংখ্যা ২৮৬টি। সবচেয়ে ছোট সূরা 'সূরা আল কাউসার'। সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয় সূরা আলাকের প্রথম ৫আয়াত। হযরত আবু বকর রা. এর আমলে হযরত ওমর রা. এর পরামর্শে/অনুরোধে কুরআনকে একত্রে লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা হয়।

নোবেল পুরষ্কারঃ

১৯০১ সাল থেকে সুডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডিনামাইটের আবিস্কারক লফ্রেন্ড নোবেলের নামানুসারে ও তাঁর উইল অনুসারে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়। নোবেল পুরষ্কার সর্বোচ্চ সম্মানিত পুরস্কার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত ব্যাক্তিকে নোবেল লরিয়েট বলা হয়। শুরুতে ৫টি বিষয়ে, চিকিৎসা, পদার্থবিজ্ঞান , রসায়ন, সাহিত্য ও শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হতো। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সাল থেকে আরো একটি বিষয় অর্থনীততে নোবেল পুরষ্কার দেওয়া হচ্ছে। শুধু মাত্র শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার নরওয়ে থেকে দেওয়া হয়, আর বাকি গুলা সুইডেন থেকে দেওয়া হয়। নোবেল পুরষ্কার হিসেবে একটি স্বর্ণপদক, একটি সনদ ও

নোবেল ফাউন্ডেশন কর্তৃক কিছু অর্থ প্রদান করা হয়। ২০১২ সালে সেই অর্থের পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ সুইডিশ মুদ্রা। বাংলাদেশের একমাত্র ব্যক্তি হিসেবে ২০০৬ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনুস শান্তিতে নোবেল পুরষ্কার পান ও তার প্রতিষ্ঠান একই বছর নোবেল পুরষ্কার পান। এছাড়া প্রথম বাঙালি হিসেবে ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যে নোবেল লেয়েছিলেন। অর্মত্য সেন ১৯৯৮ সালে ও সর্বশেষ অভিজিৎ বন্দোপধ্যায় অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছিল।

জাতিসংঘ (ঞযব টহরঃবফ ঘধঃরড়হং)

জাতিসংঘ (ঞযব টহরঃবফ ঘধঃরড়হং) একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ১৯৪৫ সালের ২৪ই অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হিসেবে প্রতিবছর ২৪ই অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস পালন করা হয়। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। জাতিসংঘের ৯ম ও বর্তমান মহাসচিব হলেন এন্টিনিও গোতারেস, যিনি পর্তুগালের নাগরিক। জাতিসংঘের মোট সদস্য দেশ সংখ্যা ১৯৩টি, এবং স্থায়ী রাষ্ট্র সংখ্যা ৫টি; যথা- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও চীন। এর সদরদপ্তর নিউইয়র্ক শহরে। এর দপ্তরিক ভাষা ৬টি; যথা- ইংরেজি, চিনা, আরবি, ফরাসি, রুশ , স্পানিশ। জাতিসংঘের ৬টি অংগসংস্থা রয়েছে, যথা- সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক আদালত ও সচিবালয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশ, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।

সার্ক (ঝঅঅজঈ)

ঝঅঅজঈ এর পূর্ণরূপ হলো- ঝড়ঁঃয অংরধহ অংংড়পরধঃরড়হ ভড়ৎ জবমরড়হধষ ঈড়ড়ঢ়বৎধঃরড়হ অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ান আঞ্চলিক সহযোগীতা সংস্থা। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা বৃদ্ধির জন্য সার্ক গঠন করা হয়েছে। এটি ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর জিয়াউর রহমানের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এজন্য জিয়াউর রহমানকে সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা বলা হয়। এর সদরদপ্তর নেপালের কাঠমুন্ডুতে। প্রতিষ্কালে এর সদস্য দেশ ছিল ৭টি; যথা- বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। ২০০৭ সালে আফগানিস্তান যোগ দেওয়ায় এর সদস্য সংখ্যা এখন ৮টি। এর দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজি।

মুক্তিযুদ্ধঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধ হলো ১৯৭১ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের একটি বিল্পব ও সশস্ত্র সংগ্রাম। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধীনতার আন্দোলনে ধারাবাহিকতায় ও বাঙালি গণহত্যার প্রেক্ষিতে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ই মার্চ ২৬ই মার্স হতে ১৬ই ডিসেম্বর লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বিজয়। এজন্য ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। আমাদের বিভাগ ঢাকা ছিল ২নং, এবং জেলা টাংগাইল ছিল ১১ নং সেক্টরের অধিনে। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সেনাপতি ছিল কর্নেল এম এ বি ওসমানী। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে ঢাকায় আগারগাঁওয়ে

স্থাপিত করা হয় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। যা ১৯৯৬ সালের ২২ই মার্চ উদ্ভোদন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের অনেক দূর্লভ বস্তু আছে এই জাদুঘরে।

বঙ্গোপসাগর (বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমানার বিশাল জলরাশি)

বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ এশিয়ার একটি বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমানায় অবস্থান করে। এটি একটি বিশাল এবং গভীর সমুদ্র যা পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, যা তার জলবায়ু, পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

সাগরের বৈশিষ্ট্য

বঙ্গোপসাগরের জলের রঙ সবুজাভ নীল, যা এর গভীরতা এবং বিশালতা নির্দেশ করে। এর পানির উষ্ণতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা এখানকার জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলির সাথে সম্পর্কিত। সমুদ্রের এই অংশে পানির গভীরতা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, কিছু অংশে এটি অত্যন্ত গভীর, আবার কিছু অংশে এটি তুলনামূলকভাবে সম浅।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য

বঙ্গোপসাগর তার প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্যের জন্য সুপরিচিত। এর তলদেশে প্রচুর পরিমাণে খনিজ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ রয়েছে। পাশাপাশি, এখানে নানা প্রজাতির সামুদ্রিক জীবের বসবাস। সাগরের পানিতে পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া, শেলফিশ এবং সামুদ্রিক উদ্ভিদ। এসব সামুদ্রিক জীব বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মৎস্যসম্পদ

বঙ্গোপসাগর বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের একটি প্রধান উৎস। এখানে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরা হয়, যা স্থানীয় মানুষের খাদ্য এবং আয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মৎস্য খাতের একটি বড় অংশ এই সাগরের উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন বিভিন্ন মাছ এবং অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের কারণে, এখানকার মৎস্যসম্পদ দেশীয় বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

মৌসুমি বৃষ্টির প্রভাব

বঙ্গোপসাগরের জল বাংলাদেশের মৌসুমি বৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প নিয়ে আসে, যা ভারী বৃষ্টির কারণ হয়। এই বৃষ্টি দেশের কৃষি ক্ষেত্রের জন্য অপরিহার্য, কারণ এটি প্রধান ফসলগুলির জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বঙ্গোপসাগরের প্রভাব শুধু মৎস্যসম্পদ এবং মৌসুমি বৃষ্টিতে সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। সাগরের উপরিভাগে বায়ু চাপের পরিবর্তন এবং পানির তাপমাত্রার পার্থক্য ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করতে পারে, যা বাংলাদেশের উপকূলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও মানবিক সংকটের কারণ হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় এবং এর প্রভাব

বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়গুলির কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় নিয়মিতভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। প্রতি বছর বঙ্গোপসাগর থেকে আসা ঘূর্ণিঝড়গুলি মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রবল বাতাস, ভারী বৃষ্টি, এবং জলোচ্ছাসের মতো সমস্যার সৃষ্টি হয়, যা স্থানীয় জনগণের জীবিকা এবং স্থায়িত্বের জন্য হুমকি সৃষ্টি করে।

পরিবেশগত সংকট

বঙ্গোপসাগরের পরিবেশও বিভিন্ন ধরনের সংকটের সম্মুখীন। প্লাস্টিক এবং অন্যান্য দূষণকারী পদার্থ সাগরের পানিতে মিশে যায়, যা সামুদ্রিক জীবের স্বাস্থ্য এবং সাগরের ইকোসিস্টেমকে বিপন্ন করে। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতিরোধ্য ব্যবহার এবং দূষণের কারণে সাগরের পরিবেশগত অবস্থার অবনতি ঘটছে।

সাগরের তলদেশে অগ্নি পর্বত

বঙ্গোপসাগরের তলদেশে কিছু সুপ্ত অগ্নি পর্বতের অস্তিত্ব রয়েছে, যা সাগরের ভূতাত্ত্বিক গঠন এবং পরিবেশগত অবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসব অগ্নি পর্বত ভূমিকম্প এবং অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক ঘটনাসমূহের জন্য দায়ী হতে পারে, যা সাগরের এবং এর তীরবর্তী এলাকায় প্রভাব ফেলতে পারে।

পর্যটন এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত সমুদ্রসৈকতগুলি পর্যটকদের জন্য এক আকর্ষণীয় গন্তব্য। সাগরের তীরবর্তী এলাকায় সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং আরামদায়ক জলবায়ু পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এখানকার স্থানীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যও সাগরের সাথে সম্পর্কিত। স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতি বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

সামুদ্রিক গবেষণা

বঙ্গোপসাগরের পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপারে গবেষণা চলছে। সাগরের জলবায়ু, জীববৈচিত্র্য, এবং ভূতাত্ত্বিক গঠন নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। এসব গবেষণার মাধ্যমে সাগরের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে জানা যাচ্ছে।

# #

শিক্ষাবৃত্তি পরীক্ষা ২০২৪

পূর্ণমান : ১০০

প্রশ্ন সংখ্যা : ১০০ টি (প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান)

প্রশ্নের ধরন : বহুনির্বাচনী (চারটি অপশনের মধ্য থেকে ১ টি বাচাই করে বৃত্ত ভরাট করতে হবে ।